KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫ নবীন সরকার লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : হীরেন্দ্রনাথ মোদক
Title উন্মোচন	Size 5" X 8" 12.70 X 20.32 c.m.
Vol. & Number : ১/৩ ১/৪ ১/৫	Year of Publication ফাল্গুন, ১৩৮১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ আষাঢ়, ১৩৮২
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : হীরেন্দ্রনাথ মোদক	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

The sweet scented hair oil

"SIVANI"

is a marvellous brain specific, prepared with Ayurvedic drugs in pure

TEAL OIL

A PERFECT REMEDY FOR

Blood Pressure

Examined and highly recommended for use by

J. C. Ghosh D sc. (Lond)
Provost of the
Dacca University,

H. K. Sen M.A., D.I.C., D sc. (Lond)
Prof Appd. Chemistry,
Calcutta University

— AND —

other well-known Chemists.

"সুরভি"

পবিত্র যোড়শাঙ্গ দেবার্চ্চন ধূপ ব্যবহারে বঙ্গ-কুটীর-শিল্পের পোষকতা করুন।

এজেন্ট :— কাঙ্গালীচরণ দত্ত
১৩নং কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চা খেতে হয় ত

"অরফ্যানের চা"

কারণ ইহা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় অথচ দামে সস্তা।

প্রাপ্তিস্থান—

অরফ্যান টী কোং

১১নং হ্যারিসন রোড,
১৩৩নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

"সবল হও, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপ-বর্ত্তী হইবে। শরীর শক্ত হইলে গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে।"

—বিবেকানন্দ।

খেলার ও শরীরচর্চ্চার যাবতীয় সরঞ্জাম অতি সুলভ মূল্যে আমাদের কাছে পাইবেন।

মোহনতোষ ব্রাদার্স

১৫ন কং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ :—ভবানীপুর।

কে বলে দেশী কালিতে কলম খারাপ হয়?

কাজল কালি

যে কোন বিদেশী কালির সমকক্ষ হইতে পারে।

সকল মূল্যবান কলমেই ব্যবহার করা যায়

কাজল কালি

ফাল্গুন ১৩৪১	উন্মোচন	প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

আশীর্ব্বাণী

হে উদয়, নিঃশব্দে এসো, আকাশের তিমির গুণ্ঠন
করো উন্মোচন।
হে প্রাণ, অন্তরে থেকে মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।
হে চিত্ত, জাগ্রত হও, জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।
ভেদবুদ্ধি তামসের মোহ যবনিকা, হে আত্মন্
করো উন্মোচন॥

১৪ মাঘ
১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

আশীর্ব্বাদ

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

তোমরা আমার কাছে চেয়েছো আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ করবার আমার অধিকার আছে, কারণ প্রথমতঃ,—তোমাদের মতে আমি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক। আর প্রবীণ সাহিত্যিকের অর্থ বোধ হয় সেই ব্যক্তি, যার বর্ত্তমানে আর সাহিত্য রচনা করবার শক্তি নেই—শক্তি আছে শুধু সিদ্ধিরস্তু বলবার। দ্বিতীয়তঃ—আমার পূর্ব্ব পুরুষদের জাত-ব্যবসা ছিল পাঁচজনকে আশীর্ব্বাদ করা, অর্থাৎ তাঁরা কারও কাছে উপুড়হস্ত করতেন না, সকলের কাছেই চিৎ-হস্ত দেখাতেন—বোধ হয় কিছু ভিক্ষে নেবার মানসে। কিন্তু এখন আর কাউকেই আশীর্ব্বাদ করবার মত স্পর্দ্ধা আমাদের নেই, কারণ জানি ও gesture এর কোনও ফল নেই। ফলে হাতের এই মুদ্রাদোষ এখন আর নেই আছে শুধু কলমের। প্রতি সাহিত্যিককেই নিজ চেষ্টায় আত্মবলে সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, অপরের উপরহস্ত বা চিৎহস্তের সাহায্যে নয়। প্রতি সাহিত্যিকই একলা।—দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ—এমন কথা কোনও সাহিত্যিকের মুখেই শোভা পায় না। কারণ সামাজিক মনোভাব সাহিত্য গড়ে' তোলে না, সাহিত্যই কতক অংশে সামাজিক মনোভাব গড়ে' তোলে। সমাজ বহুলোকের জীবনযাত্রার আইন কানুন গড়ে, কিন্তু বহুলোকের যে সামাজিক মনোভাবের অতিরিক্ত মন ব'লে একটা জিনিষ আছে, সাহিত্য সেই মনেরই খোরাক যোগায়। যে মন থেকে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, সে মন বাঙালী জাতির অনেক পরিমাণে আছে, আর সেই মনের প্রকাশই সাহিত্য। আমি নতুন লেখকদের আশীর্ব্বাদ করতে সাহসী না হলেও তাঁদের আবির্ভাবে খুসী হই। কারণ সাহিত্য কেবল মাত্র অতীতের বস্তু নয়, যুগে যুগে নতুন রূপে দেখা দেয়; কেননা সাহিত্যিক মনও নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের নিয়মের

অধীন। প্রবীণ সাহিত্যিক কথাটার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারি নে। আমরা যারা পৃথিবীতে অনেক কাল ধরে আছি, আমরাও এক কালে তরুণ ছিলুম, এখন প্রবীণ হয়েছি। কিন্তু বয়েস মাত্র সাহিত্যের মাপকাঠি নয়। প্রতি সাহিত্যিকই নবীন সাহিত্যিক, কারণ যাঁর লেখায় ভাবের কি ভাষার কিছু নূতনত্ব নেই—যা লোকের মন স্পর্শ করে, এমন কি ধাক্কাও দেয়—তাঁর লেখা সাহিত্য নয়। এই নূতনত্বের সাক্ষাৎ আমরা কিশোর লেখকের লেখাতেও পেতে পারি, বৃদ্ধ লেখকের লেখাতেও পেতে পারি। একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের সদ্য প্রকাশিত গল্প "চার অধ্যায়" কি প্রবীণ সাহিত্য না তরুণ সাহিত্য? অনেকে প্রথম বয়সেও মৃত, শেষ বয়েসেও তাই। কেউ কেউ আবার অল্প বয়েসেও বাচাল, এবং বেশী বয়েসেও বেশী বাচাল হন। অবশ্য এ উভয়ের কেউই সাহিত্যিক নন্। তবে এই কথাটি মনে রেখো যে, নতুন কিছু করব মনে করে বদ্ধ-পরিকর হলে নতুন কিছু করা যায় না। যে নূতনত্বের সন্ধানে আমরা ফিরি, সে নিজের অন্তরেই আবিষ্কার করতে হয়।

তোমাদের কাগজের নাম শুনে আমি খুসী হয়েছি। আমরা এত রকম বন্ধনে জড়িত যে অনেক বন্ধন "উন্মোচন" করবার চেষ্টা করাই আমাদের এ যুগের প্রধান কর্ত্তব্য; এবং নানা রকম সামাজিক ও মানসিক জড়তা হতে মুক্ত হওয়া। সাহিত্য হচ্ছে এ মুক্তিলাভের প্রধান অস্ত্র। ইতি—

চিঠি

লক্ষ্ণৌ ১৮।১।৩৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

.....চিঠি পেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে আমি এতই ব্যস্ত আছি যে কোন সময় করে উঠতে পারব বলে মনে হয় না। পরীক্ষা আসছে সামনে তা ছাড়া শীত পড়েছে অত্যন্ত। অবসর পেলে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করা কঠিন হবে না। ইতিমধ্যে আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

কি উন্মোচন করছেন? উন্মুক্ত মূর্ত্তি সব সময়ে সুন্দর হয় না। অ-সুন্দরকে শ্রদ্ধা করেন ত? অবগুণ্ঠিতা ইন্দ্রজালমণ্ডিত বলেই আমাদের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। মোহমুক্তির বড়ই প্রয়োজন আমাদের সমাজে।

আপনাদের বক্তব্য কি তাও জানি না। যদি পত্রিকা পাই, নিতান্ত মনোযোগ সহকারে পড়ব। যদি নতুন লেখক যোগাড় করতে পারেন তবেই মঙ্গল, নচেৎ নাম কীর্ত্তন শোনবার লোভ নেই। আপনার দলের মধ্যে যদি এমন লোক থাকেন যিনি লেখায় অনভিজ্ঞ হলেও চিন্তায় তৎপর তবেই মঙ্গল। আমার নতুনত্বের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করে এই ক্ষুদ্র চিঠি শেষ করছি। ইতি—

ধূর্জ্জটি প্রসাদ

পত্রখানি শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

মৌনব্রত

=শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আজি ধূলা ঝেড়ে ঝেড়ে, পুরাতন পুঁথি খুঁজে দেখি—
যে-গান করেছি পুঁজি, সে সকল মিছে আর মেকি,
নিরুদ্দিষ্ট অতিকথা, নিরর্থক বাক্যের জঞ্জাল।
বিলুণ্ঠিত শবাধারে অসংহত অনাম কঙ্কাল
পরিহরি অবজ্ঞায়, মহাকাল করেছে যে চুরি
প্রতীকের পরমার্থ, অবিকল পদের মাধুরী,
উপমার অন্তর্দ্দীপ্তি, উৎপ্রেক্ষার নিগূঢ় আকৃতি।
কেমনে বিশ্বাস করি—কোনো চিরসুন্দরের দূতী
পেয়েছিলো একদিন অসম্বন্ধ এই ধ্বংসস্তূপে
অমর আত্মার সাড়া; তাহার প্রত্যেক রোমকূপে
অকস্মাৎ জেগেছিলো প্রাণদ প্রণব প্রতিধ্বনি
এ-বিলগ্ন শব্দচয়ে; অন্ধ অবচেতনার খনি
বৈদ্যুতিক ব্যঞ্জনায় হয়েছিলো ক্ষণেক ভাস্বর?

নৈরাশ্যনিবিড় তাই হয়ে ওঠে মোর কণ্ঠস্বর
যখনি বলিতে চাই আত্মকথা তোমারে, সুন্দরী।
তোমার অগাধ দৃষ্টি থামে যেই মোর মুখোপরি
সনির্ব্বন্ধ জিজ্ঞাসায়, অমনি যে পড়ে মোর মনে
এবারেও যা গাহিবো, যাযাবর কালের লুণ্ঠনে
দুরূহ প্রলাপে তাহা অচিরাৎ হবে পরিণত।
জানি জানি সুনিশ্চয়, এবারেও পূর্ব্বেকার মতো
আত্মপ্রকাশের চেষ্টা সর্ব্বংসহ ধরণীর ভার
অনশ্বর অবস্করে পরিপুষ্ট করিবে আবার।
ব্যর্থ হবে বৃথা বাক্য, লজ্জাকর আত্মনিবেদনে
কাটিবেনা ব্যাসকূট। তার চেয়ে তোমার আননে
এমনি অবাক চোখে চেয়ে থাকা শতবার শ্রেয়।
সংক্ষিপ্ত ভাষার শক্তি, নীরবতা অক্ষয় অমেয়॥

দিনের শেষে

—শ্রীসজনীকান্ত দাস

প্রেমের তপস্যা করি দূর করি অতীতের গ্লানি,
যত ডুবি নিরাশায় হে প্রিয়ে, তোমারে তত মানি।
যত দ্বন্দ্ব মনে জাগে তত গাঢ় অনুরাগে
তোমারে আঁকড়ি ধরে মন মোর স্বপন-সন্ধানী।
মুষ্ঠিতলে গলে-পড়া জলে জাগে অন্তহীন আশা,
ছুটে চলা অন্ধকারে ফুটে ওঠে অধরের ভাষা,
তুমি যত রচ বাধা তত মোর বাড়ে ভালবাসা।

নদীর অশান্ত হাওয়া খেলে যায় ঝাউয়ের শাখায়,
গোধূলির খেলা শেষ নীড়ে ফেরা পাখীর পাখায়;
ক্ষণিক রঙের মায়া তারপর কালো ছায়া
ধূলিতলে নিষ্পেষিত পড়ে থাকি কালের চাকায়।
পড়ে থাকি তবু হর্ষে শিহরিয়া করি অনুভব,
রথচক্র নেমিতলে জর্জরিত আমার বৈভব,
ঊর্দ্ধে কাঁদে ঝাউশাখা পদতলে জলকলরব।

দেখেছি দিনের শেষে তবুও তো চিনেছি সহজে,
অতীতের ছিন্নসূত্র ছোট দুটি নয়নে বহ যে;
প্রসারিত বাহুপাশে হর্ষোচ্ছল কল ভাষে
পরিচিত পথিকেরে বুকে তব ডাকিয়া লহ যে।
নিজেরে ঢালিয়া দিতে তুমি তুলে লহ মোর দান,
তোমারে নিকটে পেয়ে স্বপনের করি যে সন্ধান,
স্বপনের পরপারে প্রাণেরে খুঁজিয়া ফেরে প্রাণ।

এ সন্ধানে নিরন্তর বিরহ মিলনে দ্বন্দ্ব চলে,
রবিশশী ডুবে যায়, আকাশে নক্ষত্র শুধু জ্বলে;
ম্লান ছায়াপথ ধরি ভাসে দুজনার তরী,
কভু মুখে হাসি জাগে, কভু চোখ ভরে আসে জলে।
অনন্ত তপস্যা মোর, অনন্ত তোমার পরিচয়,
তারি মাঝখানে সদা আমাদের ব্যাকুল সংশয়,
যত কাছে পাই মোর তত জাগে হারাবার ভয়।

উত্তরায়ণ

—শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পাখার ঝাপট হানি' উড়ে গেল লক্ষ নিশাচর।
পেচকের, বাদুড়ের, শৃগালের সম্মিলিত রবে
জেগেছে তামসী রাত্রি!—তৃষাতুরা প্রেতিনীরা সবে
হাসে ক্রূর অট্টহাস,—হিমশ্বাস, রুদ্ধ হাহাস্বর
টানিয়াছে আবরণ মৃতজ্যোৎস্না ধরণীর 'পর।
পর্ব্বতে গলিছে লাভা, সাগরের প্রমত্ত বাড়বে
উৎসারিছে সর্পিল বিজলী-জ্বালা!—বুঝি আজ হবে
অদ্ভুত সংগ্রাম এক,—অন্ধ হ'লো তাই চরাচর!

চলো আরো দূরে যাই, অস্তিত্বের কোথা সেই তল
খুঁজিব দুজনে মিলি'। দ্রুতবেগে হয়ে যাই পার,
সরীসৃপ-শিহরিত ধূমনীল ঘৃণ্য অন্ধকার!
যেখানে জন্মিছে জ্যোতি রুদ্ধমান্ সিন্ধুগর্ভ হ'তে—
নিত্যকাল কমল-সুরভি।—যেথা, সবিতৃমণ্ডল,
গায়ত্রী-মন্ত্রের মালা জড়াইছে স্বপ্নের সৈকতে!

ডায়েরীর এক পাতা

=শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫ শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ৮ই জুন ১৯৩৪…

বিকেলে কালো আর আমি মোল্লাহাটির পথে বেড়াতে গেলাম। আজ দুপুরে যখন এ পাড়ার ঘাট থেকে ও পাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাই, তখনই খুব মেঘ ক'রে ছিল—একটু পরে সেই যে বৃষ্টি এল—আর রোদ ওঠেনি। মেঘকরা বিকেলে শ্যামল মাঠ ও দূরের বাঁশবন, বড় বড় বটগাছ,—এক রকম কি গাছ আছে, মখমলের মত নরম সবুজ পাতা, ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে ঝোপের সৃষ্টি করে—এ সবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মোল্লাহাটি ও পাঁচপোতা-বামুনডাঙ্গার পথের মোড়ে গিয়ে এক খানা ছই ঢাকা গরুর গাড়ীর সঙ্গে দেখা হোল। তাদের গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে —বাবুর কাছে কি বিড়ি আছে?—

—না, নেই। বিড়ি খাইনে—

—আপনারা কোথায় যাবেন?—

—কোথাও যাবনা, এই পথে একটু বেড়াচ্ছি।—

ফিরবার পথে মনে হোল কলকাতায় থাকবার সময় যখন গাছপালার জন্যে মনটা হাঁপায়, তখন যে কোন একটু ছবি, একটা বনের ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয়—ওঃ! কি সুন্দর বনই এদেশে! প্রায়ই বিদেশের ফটো, আফ্রিকার কি দক্ষিণ আমেরিকার—কিন্তু তখন ভুলে যাই যে আমাদের গ্রামের চারিপাশে সত্যিকার বন জঙ্গল আছে অতি অপূর্ব্ব ধরণের! যখন বিলিতি Gardening Annual দেখি তখন ভুলে যাই কত ধরণের অদ্ভুত গাছ আছে আমাদের বনে জঙ্গলে যা বাগানে পার্কে গিয়ে রোপণ করলে অতি সুদৃশ্য কুঞ্জবন সৃষ্টি করে—যেমন ঘাঁড়া, কুঁচলতা, ঐ নাম না জানা গাছটা, এরা যে কোন বিখ্যাত পার্কের সৌন্দর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে।

সেদিন যখন আমি, রাণু, খুড়ীমা, ন'দি—নদীতে বিকেলে স্নান করছি তখন একটা অদ্ভুত ধরণের সিঁদুরে মেঘ করলে—ও পারের খড়ের মাঠের উলুবনের মাথা, শিমুল গাছের ডগা যেন অবাস্তব, অদ্ভুত দেখাল, যেন মনে হচ্ছিল ওখান থেকেই নীল আকাশটার সুরু।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় নদীতে নেমে যে অপূর্ব্ব অনুভূতি হয়েছিল তা বোধ হয় জীবনে কোনদিন হয়নি। মাথার উপর একটা তারা উঠেছে, দূরে কোথায় একটা ডাক পাখী অবিশ্রান্ত ডাকছে, মাধবপুরের চরের দিকে ভায়োলেট রঙের মেঘ করেচে। শান্ত স্তব্ধ নদীজলে তার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব।

মানুষ চায় এই প্রকৃতির পটভূমির সন্ধান। এতদিন যেন আমার Emerson এর মতের সঙ্গে খুব মিল ছিল। সেদিনও বন্ধুমহলে তর্ক করেছি—আজ একটু মনে সন্দেহ জেগেছে। মানুষ এই সৃষ্টিকে মধুরতর করেছে। ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম যদি না থাকে তবে ওর স্বার্থকতা কিছুই নয়। হৃদয়ের ধর্ম্ম সব ধর্ম্মের চেয়ে বড়।—

ঘোড়াচোর

– গল্প –

—পশুপতি ভট্টাচার্য্য

আমি লাড্ মোজ্‌লির চিতা ঘোড়া চুরি করিনি।

দেশশুদ্ধ লোক আমাকে এখন চোর সাব্যস্ত করছে, কিন্তু আমাকে যে জানে সেই বলবে এমন অপবাদ আমার জীবনে কখনো হয়নি। মিস্টার জন্ টার্ণার আমার সব খবরই জানেন, তাকে জিগ্যেস করলেই শুনতে পাবে। কত বছর যে ওখানে আছি তার কোনো ঠিকানা নেই, ছোট বেলা থেকে বোধ হয় জীবনভোর

তার কাছেই কাজ করছি। মিস্টার জন্ জানে আমি কখনই ঘোড়া চুরি করতে পারি না। তাই বলছি মোজ্‌লির ঘোড়া আমি চুরি করি নি, তা তিনি যতই দিব্যি গেলে বলুন। এত বড়টা হয়ে শেষে যে আমি ঘোড়াচোর হয়ে দাঁড়াবো এ কখনো সম্ভব হতে পারে না।

পরশু রাত্রে মিস্টার জন বল্‌লে তার মাদীঘোড়া বেট্‌সির উপর চ'ড়ে যেতে। গত দুবছর থেকে প্রত্যেক রবিবার রাত্রে আমি ঐ ঘোড়াটাতেই চড়ে যাই, তাই পরশু যখন বল্‌লাম একটা দরকারে আমাকে কিছু দূর যেতে হবে, তখন সে বল্‌লে ঐ ঘোড়াটাতেই যাও। মিস্টার জন্ আমাকে জিন কষে নিতেও বলেছিল, কিন্তু আমি বললাম তা আমার চাই না। একটা লাগাম আর রাশ হলেই আমার চলবে, আর কিছু দরকার নেই। ঐ রকম ক'রে ঘোড়ায় চড়তেই আমার খুব ভাল লাগে। আর যেখানে আমি যাবো সেখানে যে ঐ জিনের চানড়া থেকে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ হ'তে থাকবে এটা আমার ইচ্ছে নয়। তা ব'লে কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে আমি যাই নি; আমার নিজের একটা গোপনীয় দরকার ছিল, সে কথা অবশ্য কারো জানতে চাইবার কোনো অধিকার নেই। রবিবার রাত্রে প্রায়ই আমি জিন্ কষে নিই, কিন্তু পরশু তো ছিল বৃহস্পতিবার রাত্রি, তাই আমি সে দিন জিন্ নিলাম না।

মিস্টার জন্ টার্নার নিশ্চয় এ কথা বলবে, আমি যে চুরি করতে যাবো তেমন স্বভাবই আমার নয়। মিস্টার জনকে বরং জিগ্যেস ক'রে দেখতে পার। সে আমাকে চিরটা কাল জানে, তার বা কোনো লোকের আমি কখনো কোনো রকম অনিষ্ট করি নি।

সে দিন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বেট্‌সিকে যখন আস্তাবল থেকে বের করলাম তখন মিস্টার জন্ বাইরে এসে আবার একবার বল্‌লে জিনটা চড়িয়ে নিতে। ঘোড়াটার পিঠে হাড় বেরিয়ে আছে বটে, কিন্তু তাতে আমার যায় আসে না। মিস্টার জনকে বল্‌লাম আমি খালি পিঠেই বেশ যাবো। সে বল্‌লে আমার শরীরটা যদি দুখানা হয়ে চিরে যায় তাতে তার কি ক্ষতি হবে, আমার যেমন ক'রে খুশী তেমনি ক'রেই যাই না কেন! বরাবর সে তখন ঐখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেট্‌সির কাঁধে হাতে বুলিয়ে দিচ্ছিল, আর চেষ্টা করছিল কোথায় যাচ্ছি সে কথাটা বের করতে,

কিন্তু স্পষ্ট জিগ্যেসও করতে পারে না। তবে ঠিকই সে জানতো আমি কোথায় যাবো। আমার কোনো কথা তো জানতে তার বাকি নেই। বোধ হয় খানিকটা ঠাট্টা করবারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি ভাবে আমি সেটা নেবো তা বুঝতে না পেরে বেচারা হয় তো ইতস্ততঃ করছিল। যাই হোক সে আর জিদ করলে না, বল্‌লে জিনে চড়তে যদি ভালই না লাগে তা হলে এমনি বিনা সাজেই যাওয়া ভাল; তখন ফটক খুলে রাস্তায় গিয়ে আমি ঘোড়ায় উঠে বড়রাস্তার মোড়ের দিকে চল্লাম।

এ হচ্ছে পরশু রাত্রের কথা—বৃহস্পতিবার রাত্রি। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু তবু মিস্টার জনকে দূর থেকে পষ্ট দেখা যায়, ফটকে হেলান দিয়ে আমার দিকে চেয়ে তখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। সে দিন সমস্ত দিনটা নতুন জমিতে লাঙ্গল দিয়েছি, ভারি পরিশ্রম হয়েছে। প্রত্যেক রবিবার রাত্রে ঘোড়া আমি জোরেই ছুটিয়ে যাই, কিন্তু সে দিন কতকটা এই জন্যেই ঘোড়াকে কদমে নিয়ে চল্লাম, আর ভাবলাম তাড়া যখন নেই, বেট্‌সি নিজের চালেই চলুক্। তখনো দুঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে অথচ রাস্তা তো মাত্র তিন মাইল, কাজে কাজেই অমন আস্তে আস্তে গেলাম।

সকলেই জানে আমি লাড্ মোজ্‌লির ছোট মেয়ে নওমির কাছেই যাতায়াত করে থাকি। সে দিনও তার কাছেই ফের যাচ্ছিলাম। কিন্তু সাড়ে ন'টা না বাজলে তার সঙ্গে দেখা হবে না। সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি যেতে চাই নি। লাড্ মোজ্‌লি আমাকে হপ্তায় একবার মাত্র তার সঙ্গে দেখা করতে দেয়, কেবল রবিবার রাত্রে, আর এটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার। এর আগে আরো তিন চার বার বৃহস্পতিবার রাত্রে আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি, লাড্ মোজ্‌লি সে কথা জানে না। নওমি নিজে বলেছিল বৃহস্পতিবার রাত্রে ও তার সঙ্গে দেখা করতে; তাই হপ্তায় একবারের বেশী দেখা করা লাড্ মোজ্‌লির বারণ থাকা সত্ত্বেও আমি যেতাম। কারণ নওমি আমাকে যেতে বলেছিল; আর সেও নিজে চুপি চুপি বেরিয়ে এসে ওদের উঠোনের গাছতলায় দেখা সাক্ষাৎ করতো।

লাড্ মোজ্‌লির ওপর আমার আক্রোশ হবার কোনই কারণ নেই। মিস্টার জন টার্নারকে জিগ্যেস করলেই তা জানতে পারবে। তবে তাকে আমি বিশেষ ভক্তি করি না, আর সেও তা জানে। নওমিকে আমি যেমন ভালবাসি তা যদি

তুমি কাউকে বেসে থাকো তা হলেই বুঝতে পারবে হপ্তায় একবার মাত্র দেখা পেয়ে কিছুতে চলে না। আমার তো মনে হয় সেও আমাকে একটু পছন্দ করে, নইলে লাড্ মোজ্‌লির বারণের ওপর কখনো সে আমাকে বৃহস্পতিবারে যেতে বল্‌তো না। লাড্ মোজ্‌লি ভাবে হপ্তায় একবারের বেশী দেখা করতে দিলে তার আর কোনো শাসন থাকবে না, আমরা যখন খুসী নিজেদের খেয়াল মত বিয়ে ক'রে ফেলবো। এই জন্যেই সে ব'লে রেখেছিল তার বাড়ীতে হপ্তায় একবার কেবল ঐ রবিবার রাত্রিটি ছাড়া আর আমি যেতে পাবো না।

এখন সে মতলব করেছে তার চিতা ঘোড়া চুরি করার অপরাধে আমাকে বিশ বছর জেলে পাঠাবে। আমার তো মনে হয় সে ভাল মতেই জানে আমি ঘোড়া চুরি করি নি, কিন্তু যখন একটা সুবিধে পেয়ে গেছে তখন এই ছুতোয় আমাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য বর জুটিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে। ফন্দিটা আমি বুঝেছি; নইলে সকলেই জানে আমি কখনো ঘোড়াচোর নই। মিস্টার জন্ আমাকে বিলক্ষণ জানে। এত দিন আমি তার কাছে কাজ করেছি, আমার সঙ্গে একটা সাংসারিক সম্বন্ধ পাতাতেও সে চেয়েছিল, আমিই তাতে রাজি হই নি।

তার পর পরশু বৃহস্পতিবার রাত্রে আমি খালি পিঠে বেট্‌সির ওপর চ'ড়ে তো বাড়ী থেকে বেরুলাম। একমাইল গিয়ে রাস্তার মোড়ে নেমে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম তারপর ঘড়ি খুলে দেখলাম ঠিক তখন ন'টা। আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে লাড্ মোজ্‌লির বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। তার বসতবাড়ী আর গোলাবাড়ীর চারিধার তখন একেবারে নিস্তব্ধ, এতক্ষণে তার শোবার সময়। গোলাবাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত গিয়ে থামলাম, বৃহস্পতিবারে আমি তাই করি। নওমি যে ঘরে তার দিদি মেরীর সঙ্গে শোয় সেই ঘরে দেখি আলো জ্বল্‌ছে। আমরা লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম সাড়ে নটার সময় মেরী হয় কারো সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যায় নয় তো শুয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি নওমি খাটের ওপর আড়াআড়ি ভাবে শুয়ে আছে, আর মেরী পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি সব তাকে বলছে। বুঝলাম গতিক সুবিধে নয়, কারণ মেরী যখন নওমিকে কাপড় ছেড়ে তার সঙ্গে শুতে বলে, তখনই বোঝা যায় যে এর পর তার ঘর থেকে বেরুতে দু'একঘণ্টা দেরী হবে। মেরী যতক্ষণ

না ঘুমিয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে, তার পর অন্ধকারের মধ্যে কাপড় চোপড় প'রে উঠোনের গাছতলায় এসে পৌঁছলে তবে তার সঙ্গে দেখা হবে।

ঘোড়ার ওপর বসেই আমি দশ পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে দেখলাম নওমি তার দিদির কথায় কি করে। কিছু পর দেখি সে বিছানা ছেড়ে উঠে কাপড় ছাড়তে সুরু করলে! বুঝলাম আরো এক ঘণ্টা কিংবা তারো বেশী সময় গেলে তবে সে বেরিয়ে আসতে পারবে। তখন চাঁদ উঠেছে, গোলাবাড়ীর উঠোনে দিনের মত আলো ফুট্ ফুট্ করছে। অন্যদিন হ'লে আমি ফটক খুলে বেট্‌সিকে সেই উঠোনের মধ্যে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু পরশু তা করতে সাহস হোলো না। যদি হঠাৎ লাড্ মোজ্‌লি একবার জল খেতে ওঠে কিংবা অন্য কারণে ঘুম ভেঙে যায়, আর উঠোনের দিকে চেয়ে দেখে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে তা হলেই মুস্কিল হবে, হয় তো তার নিজের কোনো ঘোড়া বেরিয়ে এসেছে ভেবে তাকে আস্তাবলে ঢোকাতে আসবে, না হয় তো আমি এসেছি তা ধরে ফেলবে। এই ভেবে আমি আস্তাবলের দরজা খুলে অন্ধকারে যে ঘরটা খালি পেলাম তারি মধ্যে বেট্‌সিকে ঢুকিয়ে দিলাম। একটা দেশলাই জ্বালতেও সাহস হোলো না, কি জানি যদি লাড্ মোজ্‌লি জানলার দিকে চেয়ে থাকে তা হোলেই আলো জ্বালা দেখে ফেলতে পারে। আস্তাবল্-ঘরের মধ্যে বেট্‌সিকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম, যতক্ষণ পর্য্যন্ত নওমি বেরিয়ে না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

তার পর শেষে যখন বাড়ী ফেরার সময় হোলো তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা কি একটা। চাঁদ তখন মেঘে ঢেকে গেছে, সমস্ত গোলাবাড়ী একেবারে অন্ধকার। তখনো দেশলাই জ্বালতে ভয় আছে, হাত্‌রে হাত্‌রে আস্তাবল ঘরের ভিতর থেকে বেট্‌সিকে আনতে গেলাম। চোখে কিছুই দেখা যায় না, হাত্‌রে হাত্‌য়ে তার গলাটা পেলাম, হাত দিয়ে দেখি গলায় কোন লাগাম নেই। মনে করলাম কখনো কখনো যেমন বেশীক্ষণ দেরী হয়ে গেলে গলার লাগামটা খুলে ফেলে দেয়, এবারও সে তাই করেছে। বিনা লাগামে আমার তার ওপর চড়তে ভয় হোলো, কি জানি হঠাৎ ভড়্‌কে উঠে ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করবে আর লাড্ মোজ্‌লি উঠবে জেগে। লাগামটার জন্যে মাটী হাত্‌রে বেড়ালাম, কোথাও সেটা পেলাম না। আস্তবলে ফিরে

গিয়ে দরজার কাছে দেওয়ালে হাত দিতেই হাতে ঠেকলো, লাগামশুদ্ধ একটা লোহার কাজাই সেখানে টাঙানো রয়েছে। সেইটি নিয়ে ঘোড়ার মুখে চড়িয়ে দিয়ে তাকে বাইরে আনলাম। তখনো এমন অন্ধকার যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, হাত্‌রে হাত্‌রে ফটকের বাইরে এলাম। রাস্তায় এসেই লাফ দিয়ে তার পিঠের ওপর চড়লাম, আর মিছে সময় নষ্ট না ক'রে একেবারে বাড়ী রওনা হলাম। এবার মনে হোলো ঘোড়ার দুল্‌কি চালটা যেন কেমন কেমন, দোলানিতে পিঠের এপাশে ওপাশে কাৎ হয়ে পড়ছিলাম, আর জিন্‌ও নেই যে সেটা চেপে ধরবো। যা হোক একরকম ক'রে বাড়ী তো পৌঁছলাম, তার পর লাগামটা খুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিলাম। তখন রাত একটার কাছাকাছি হবে।

পরদিন সকালে উঠে জল টল খেয়ে যখন নূতন মাঠে চাষ করতে বেরুবো, এমন সময় লাড মোজ্‌লি তিন চার জন লোকের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির, সঙ্গে আদালতের শেরিফ্‌। মিস্টার জন তখন বেরিয়ে এলো, তার সঙ্গে হাসিঠাট্টা সুরু ক'রে দিলে। আধ ঘণ্টার পরে মিস্টার জন্‌কে আমার নাম ক'রে তারা জিগ্যেস করলে আমি কোথায় আছি। মিস্টার জন্‌ বল্‌লে আমি চাষে যাবো বলে তৈরী হচ্ছি, শেরিফ্‌ তখন বল্‌লে আমার নামে ওয়ারেণ্ট্‌ আছে। মিস্টার জন্‌ জিগ্যেস করলে, কেন,—সে বল্‌লে আমি লাড্‌ মোজ্‌লির চিতা ঘোড়া চুরি করেছি। ঠাট্টা করছে মনে ক'রে মিস্টার জন্‌ যখন হেসে উঠলো, তখন সে ওয়ারেণ্টের কাগজ খানা বের ক'রে দেখালে। মিস্টার জন্‌ তবু সে কথা বিশ্বাস করলে না, বল্‌লে নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে, কারণ আমার দ্বারা কখনো এ কাজ হোতে পারে না। মিস্টার জন্‌ ঠিক জানে আমি ঘোড়া চোর নই। এ সব গোলমেলে ব্যাপারে আমি জীবনে কখনও যাইনি।

তখনি তারা আমাকে সহরে নিয়ে এসে হাজত-ঘরে পুরলে। আমি তো জানি আমি লাড্‌ মোজ্‌লির ঘোড়া চুরি করি নি, তাই একটুও আমার ভয় হোলো না। কিন্তু আমাকে রেখে তারা আবার ফিরে গেল, সেখানে গিয়ে দেখলে বেট্‌সির আস্তাবলে লাড্‌ মোজ্‌লির চিতা ঘোড়াটাই রয়েছে। তারপর তারা লাড্‌ মোজ্‌লির বাড়ীতে গেল, সেখানে আস্তাবলে গিয়ে আমার পায়ের দাগ মাপলে, আর বেট্‌সির

লাগামটাও সেখানে পেলে। লাড্‌ মোজ্‌লি বলে আমি মিস্টার জনের ঘোড়ায় সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি, তারপর লাগামটা খুলে নিয়ে চিতা ঘোড়ার মুখে পরিয়ে তার ওপর চড়ে চলে এসেছি। আস্তাবলের দরজাটা তালা লাগানো ছিল না তাই সেটা ভাঙবার কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে বেট্‌সিকে যখন তাদের আস্তাবলে ঢোকাই তখন দরজাটা ভাল ক'রে বন্ধ করি নি, সে ওখান থেকে বেরিয়ে রাতারাতি আপনি বাড়ী ফিরে গিয়েছিল।

লাড্‌ মোজ্‌লি বলে সে আমাকে বিশ বছর জেলে পাঠাবে, তাহ'লে তার ছোট মেয়ে নওমির জন্যে আর আমি তাকে জ্বালাতন করতে পারবো না। পয়সাওয়ালা এক দোজবরে চাষার সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়, তার বিশখানা লাঙল আছে, প্রকাণ্ড বড় বাড়ীতে তার পনেরোখানা কামরা আছে। মিস্টার জন্‌ টার্ণার বলছে সে আমার জন্যে সহরের সবচেয়ে বড় উকিল লাগাবে, কিন্তু তাতে যে বিশেষ ফল হবে তা মনে হয় না, কারণ লাড্‌ মোজ্‌লির গোলাবাড়ীর চতুর্দ্দিকে আমার পায়ের দাগ আছে, আর মিস্টার জনের আস্তাবলে লাড্‌ মোজ্‌লির সেই ঘোড়াটাকেই পাওয়া গেছে। ইচ্ছে করলে আমি এখনি খালাস পেয়ে যেতে পারি, এমন উপায় আমার জানা আছে, কিন্তু তা আমি করতে চাই না। নওমির তাতে নিন্দে হবে; আমি যদি বলি যে তার সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম আর বেট্‌সিকে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম আস্তাবলে যাতে সে কোনো গোলমাল না করে, তার পরে বাড়ী আসবার সময় অন্ধকারে ভুল ক'রে বেট্‌সির বদলে চিতা ঘোড়াটা নিয়ে এসেছি,—তা হোলে কথাটা তার পক্ষেই বড় খারাপ শোনাবে। তা হোলে তাকেও তো স্বীকার করতে হবে যে বাড়ীর সকলে ঘুমোবার পর সে ঘর থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার পালিয়ে আসতো,—এটা কুমারীর পক্ষে সব দিক দিয়েই বদনামের কথা। আমাকেই যে সে বিয়ে করবে এমন তো কোনো কথা নেই, কিছুদিন বাদে তার মত বদলে গিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করার ইচ্ছেও তো হোতে পারে, কিন্তু এখন যদি আমার জন্যে তার একটা বদনাম রটে যায়, লোকে যদি বলে আমার জন্যে সে ঘর ছেড়ে পালাতো, —সে বড় অন্যায় কাজ হবে।

নওমি জানে আমি ঘোড়াচোর নই। সে নিশ্চয় জানে ব্যাপারটা হয়েছে

এই যে আমি ভুল করে লাড্ মোজ্‌লির চিতা ঘোড়াটা নিয়ে এসেছি আর দরজা খোলা পেয়ে বেট্‌সিও বাড়ী ফিরে চলে এসেছে।

লাড্ মোজ্‌লি আদালতের সকলকে ব'লে বেড়াচ্ছে যে কুড়ি বছরের জন্যে সে আমাকে কয়েদে পাঠাবে আর কুড়িখানা লাঙলওয়ালা সেই লোকটির সঙ্গে নওমির বিয়ে দেবে। লাড্ মোজ্‌লি এখন আমাকে কায়দায় পেয়েছে তাই এত কথা বলছে, আর তা হ'য়েও যেতে পারে,—নওমি শেষ পর্য্যন্ত কোনো কথা বলবার হয় তো সুবিধেও পাবে না! জানি না সুযোগ পেলেও সে সব কথা বলবে কি না। সকলেই জানে আমি জন্ টার্ণারের ওখানে সামান্য চাকরি করি, নওমি আমার জন্যে এতটা হয়তো নাও করতে পারে।

আদালতে দাঁড়িয়ে আমি সব কথাই খুলে বলতে পারি, কিন্তু নওমির নামটা আমি মোটেই করতে চাই না। যদি এটা পরশু বৃহস্পতিবার রাত্রি না হ'য়ে রবিবার রাত্রে হোতো তা হোলে কথাই ছিল না,—কিন্তু তা তো নয়, কথাটা বড়ই খারাপ শোনায়।

তবে নওমি যদি নিজে এসে সব কথা বলে তাতে আমি কোনো বাধা দেব না,—তা হ'লে বুঝবো সে নিজের ইচ্ছেতেই যখন বলছে তখন আমাকেই সে বিয়ে করবে; কিন্তু যদি সে চুপ ক'রে বাড়ীতেই থেকে যায় আর লাড্ মোজ্‌লি সেই পয়সাওয়ালা চাষাটার সঙ্গে জোট ক'রে আমাকে কুড়ি বছরের জন্যে জেলে পাঠায়, তাহ'লে চুপচাপ চলেই যাবো আর কি! নওমিকে আমি বরাবরই ব'লে এসেছি যে তার জন্যে আমি সব করতে পারি; আমার সে কথা আমি রাখতে পারি কি না তা প্রমাণ করবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

গল্পটি Erskine Caldwell নামক আমেরিকান লেখিকার Horse Thief নামক ইংরাজী গল্পের অনুবাদ। এঁর নাম আমাদের দেশে অজ্ঞাত, কিন্তু ১৯৩৪ সালের শ্রেষ্ঠ গল্প চয়নের মধ্যে (The best short stories of 1934, edited by O'brien) এই গল্পটি স্থান পেয়েছে।

গৌতমী

– গল্প –

—শ্রীদুর্গা দেবী

প্রাচীনকালে যে গৌতমী আপন অজ্ঞাতসারে ভগবান বুদ্ধের করুণার ছায়াতলে একদিন পরম আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, এ সেই পবিত্রচেতা সার্থকজন্মা গৌতমীর প্রেমের উপাখ্যান।

গল্পটি বড় মধুর অথচ সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর, ইহার ভাব ও বর্ণনাভঙ্গীও অতি মনোহর।

এইভাবে গল্পটি কথিত হয়ঃ—

হিমালয় গিরির পাদদেশে বিস্তীর্ণ এক মনোরম জনাকীর্ণ পল্লীতে দরিদ্র ভদ্রবংশে গৌতমীর জন্ম হইয়াছিল।

গৌতমী দীর্ঘদেহা তন্বী, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইত যেন বড় রুগ্না; শ্যামবর্ণা, হাস্যমুখী, মনটি অতি সরল ও নিরীহ; প্রতিবেশীরা বিদ্রূপ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল—"ক্ষীণা গৌতমী"; কিন্তু সে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না। যে যাহা আদেশ করিত সে অম্লানবদনে তাহাই প্রতিপালন করিত; কোনো কথাতেই সে 'না' বলিতে পারিত না, সকলের কথাতেই সে এক উত্তর করিত, "হাঁ প্রভু, এই করিতেছি।"

কেহ অপরাধ লইবেন না,—কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি গৌতমীকে বিশেষ বুদ্ধিমতী বলা যায় না। তাই বলিয়া নির্ব্বোধের মত কোনো কথাও তাহার মুখে শুনা যাইত না;—সে বেশী কথাই কহিতনা এবং সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোনো না কোনো কাজে সর্ব্বদাই নিযুক্ত হইয়া থাকিত, হয় তো সেই জন্যই কথার অবসর ঘটিত না। যে বাস সে পরিধান করিত তাহা অত্যন্ত সাধারণ, নিত্য তাহার সেই একই পরিধেয় কিন্তু সর্ব্বদাই উহা পরিচ্ছন্ন। একদিন যখন সে আপন ভাই ভগ্নীদের বস্ত্র প্রক্ষালন

করিতে গিয়াছিল, এক সুন্দর সুবেশ যুবক—ঐ দেশের রাজপুত্র—নদীতীরে ভ্রমণ করিতে গিয়া তাহাকে দেখিল ; দেখিয়াই সে অনুমান করিল এ মেয়েটি অবাধ্য বা অবুঝ বলিয়া বিবেচনা হয় না—এবং মনে হয় যে উহার হইয়া বলিবার কেহ নাই, উহাকে গ্রহণ করিলে উহার পিতামাতাও বিরোধী হইবার আশঙ্কা নাই।

রাজপুত্র এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল ঃ

"উহার পিতামাতা বলিবে—'কি আর করা যায়, গৌতমী তেমন বুদ্ধিমতীও নয়, তেমন সুন্দরীও নয় ; উহাকে আমাদের কন্যার মত বোধ হয় না, বরং দাসীর মতই বোধ হয়,—কেই বা উহাকে বিবাহ করিবে ? আজ না হউক দুদিন পরেও আর কাহারো কবলে পড়িয়া যাইত,—কারণ গৌতমী কখনও প্রত্যাখ্যান করিতে জানে না। আহা এই লোকটি যদি দয়ালু হয় এবং গৌতমীর সন্তানাদি হইলে যদি তাহার উপযুক্তরূপ প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করে তাহা হইলেই এখন যথেষ্ট !"

রাজপুত্র এই সকল কথা ভাবিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে গৌতমী বস্ত্রগুলি ধুইয়া নিংড়াইয়া এক পাশে রাখিল ; অতঃপর সে রৌদ্র-স্নাত জলের উপর হাঁটু মুড়িয়া উবু হইয়া বসিল এবং পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া তৎপরিবর্ত্তে গামছা দিয়া বুক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখিল, দীর্ঘ কৃষ্ণ-কেশদাম এলায়িত করিয়া দিল, দাঁতন দিয়া দাঁত পরিষ্কার করিল ও ধীরে ধীরে আপন অঙ্গমার্জ্জনা করিতে লাগিল ; সে জানিতেও পারিল না যে বাঁশবনের অন্তরাল হইতে রাজপুত্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পরে রাজপুত্র তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল এবং হাস্যবদনে তাহার সন্নিকটে গিয়া মধুর বচনে তাহাকে সম্বোধন করিল ঃ

"গৌতমী, অতি সুন্দর তো তোমার রূপ ! লোকে যে বলে তুমি কৃশাঙ্গী সে কথা মিথ্যা ; তোমার দীর্ঘ-দেহ সামান্য বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখ, তাই সকলে তোমাকে ভুল বোঝে। গৌতমী, আমি শুনিয়াছি তুমি সকলের কথাতেই বাধ্য হও। আমাকেও তুমি প্রত্যাখ্যান করিও না ; এই দ্বিপ্রহর সময়ে নির্জ্জন নদীতীরে কেহই আমাদের গোপন মিলন দেখিতে পাইবে না।"

গৌতমী লজ্জানম্র হইয়া শুনিতে লাগিল রাজপুত্র অঙ্গীকার পূর্ব্বক বলিতেছে তাহার প্রস্তাব অবৈধ হইবে না ; অবশেষে সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল ঃ

"প্রভু আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হউক।"

রাজপুত্র তাহার অঙ্গসান্নিধ্য লাভ করিয়া দেখিল যে আপাতঃ দৃষ্টিতে যেরূপ মনে হয় তাহা অপেক্ষা সে অনেক সুন্দর ; এবং তার কৃষ্ণ চক্ষু দুটি যদিও কোনো ভাব প্রকাশ করে না, নির্বোধ ও নিরীহের মত কেমন এক ভাবেই নিত্য চাহিয়া থাকে, তথাপি তাহাতে যথেষ্ট মোহ আছে। ইহার পর হইতে ঐ নদীতীরস্থ বাঁশবনের মধ্যে নিভৃতে তাহাদের নিত্য দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল ; রাজপুত্র যখনই তাহাকে ঐ স্থানে আসিতে বলিত গৌতমী তখনই আসিয়া উপস্থিত হইত, কখনও তাহার অন্যথা করিত না ; দেহসম্পর্ক এরূপ ঘনিষ্ঠ হওয়াতেও তাহার আকর্ষণ বা আচরণের কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না ; তাহার সামান্য মাত্র বাক্যালাপও পরম প্রীতিপ্রদ বোধ হইত। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে গৌতমী পুত্রসম্ভবা হইল।

রাজপুত্র তখন তাহাকে উপপত্নী রূপে গ্রহণ করিল এবং তাহার পরিশ্রমলব্ধ তুচ্ছ সম্পত্তি ও জীর্ণ পেটিকা সমেত তাহাকে ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া রক্ষা করিল ; গৌতমী সেখানে তাহার প্রত্যাশিত দিনটির অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কাল পূর্ণ হইলে রাজার এক অন্তঃপুরভর্ত্তৃকা আসিয়া তাহাকে উপদেশ দিল ঃ

"গৌতমী, প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে বধূ আপন পিত্রালয়ে গমন করে ইহাই সমাজের নিয়ম। কিন্তু তুমি বিবাহিতা পত্নী নও, উপপত্নী মাত্র। অতএব তোমার পিত্রালয়ে যাওয়া উচিত হয় না ; কিন্তু এখানকার যাহাতে মর্য্যাদাহানি হয় এরূপ কার্য্যও তোমার উচিত হইবে না।"

গৌতমী তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বিনাবাক্যে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া প্রাকারের বাহিরে প্রস্থান করিল !

পরিখার সেতু পার হইয়া গিয়া গৌতমী দেখিল এক অন্ধ স্থবির ভিক্ষু বৃক্ষতলে ভিক্ষাপাত্র হস্তে বসিয়া আছে ; একটি কটিবাস মাত্র তাহার পরিধান এবং তাহার অনাবৃত লোল অঙ্গ রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইতেছে।

পদশব্দ শুনিয়া অন্ধ মুখ তুলিল এবং অতি স্নেহভরা মৃদুহাস্য করিতে লাগিল ; পরম জ্ঞানী ব্যক্তিই এরূপ অর্থপূর্ণ স্নেহের হাসি হাসিতে পারে।

বৃদ্ধ বলিল—"গৌতমী, আমি চোখে দেখিতে না পাইলেও তোমার আগমন অনুভব করিতেছি। গৌতমী, তোমার পথযাত্রা নির্বিঘ্ন এবং সার্থক হউক।"

গৌতমী তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইল ; পথে যাইতে যাইতে অবশেষে এক রৌদ্রতাপদগ্ধ আম্রবনে অকালে সে এক সন্তান প্রসব করিল।

বহু দুঃখের পরে এই সন্তান লাভ করিয়া সে আনন্দাশ্রু পাত করিতে লাগিল এবং কিছুকাল বিশ্রাম লাভের পর ছেলেটিকে লইয়া হৃষ্টচিত্তে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া গেল। সন্তান-বাৎসল্যে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল, অহোরাত্র স্নেহের আনন্দে সে তন্ময় হইয়া রহিল এবং শিশুটিকে দেখিয়া দেখিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহাকে বুকের উপর টানিয়া ধরিয়া নিত্যই তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে লাগিল ; দিনে দিনে উহার জ্ঞান চৈতন্য কিরূপে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে তাহাই গৌতমীর একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় হইল।

রাজপুত্রের মুখে কিন্তু একবারও এ কথা শুনা গেল না—"আমার হৃদয়ে তুমি পুনর্ব্বার ফিরিয়া এস।" যদিও সে এক সময় তাহার অতি প্রিয় ছিল, যদিও তাহাকে রাজপুত্র একদিন বাহু সমারোহ করিয়া রাজপুরীতে আনিয়াছিল, তাহাকে বধূর বেশে সাজাইয়া কেশদাম বেণী-সম্বদ্ধ করিয়া মুখে কুঙ্কুমশোভা দিয়া তিলকাঞ্জন রচনা করিয়া অতি সমাদরে তাহাকে পুষ্পযানে উঠাইয়া আনিয়া গৌরবের স্থান দিয়াছিল, কিন্তু এখন যখন সন্তান সম্পর্কে উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইল তখন তাহার সে পূর্ব্বপ্রীতি কোথায় গেল ?

পুত্র প্রসবের পর রাজপুত্রের অবজ্ঞা ও অবহেলা গৌতমী নির্বিরোধে গ্রহণ করিল এবং এমন ভাবে তাহার চক্ষুর অন্তরালে দূরে দূরে সরিয়া রহিল, যাহাতে রাজপুত্র কোনোরূপে অকস্মাতেও তাহাকে দেখিয়া নিজেকে অপরাধী স্মরণ করিয়া মনে মনে কষ্ট না পায়।

রাজপ্রাসাদের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া এক প্রান্তে সরোবরতীরে এক সামান্য

কুটীরে গৌতমী বাসস্থাপনা করিল এবং যে সকল হংসপাল তথায় সন্তরণ করিয়া বেড়ায় উহাদের নিত্য খাদ্য যোগাইবার ভার গ্রহণ করিল।

কিছুকাল এইরূপে তাহার সুখে কাটিল এবং এই নিরাবিল সুখের পরিবর্ত্তে যে ভাগ্যলিখিত মহান্ দুঃখ একদিন তাহার উপস্থিত হইবে,—এই সময় অবধি আপন অজানিতে সে তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পরে সেই দুঃখই তাহাকে মুক্তি-লাভের একমাত্র পথ চিনাইয়া দিয়াছিল এবং পীতবাস ভিক্ষুদের ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে তাহার স্থান করিয়া দিয়াছিল।

বন্ধন যে ছিঁড়িতে পারিয়াছে এবং অন্তরে যে শান্ত ও অচঞ্চল, জীবনে সেই ধন্য।

আমাদের মধ্যে যাহাদের আপন বলিয়া জগতে কিছুই নাই তাহারাই আনন্দ লোকের সর্ব্বোচ্চ স্তরে বিচরণ করে,—যেমন আকাশে ওড়ে পাখী, তাহার আপন ডানা দুটি ছাড়া বহন করিবার তো আর কিছুই নাই !

(এটি ইভান্ বুনিনের (Ivan Bunin) Gautami নামক গল্পের অনুবাদ। বুনিন্ সাহিত্য-সৃষ্টিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এবং বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। বৌদ্ধযুগের কিম্বদন্তির সঙ্গে আপন কল্পনা মিলিয়ে তিনি এই অপূর্ব্ব মূক চরিত্রের গৌতমী সৃষ্টি করেছেন। গল্পটি রুষীয় ভাষায় লেখা, তার ইংরেজী তর্জ্জমা হয়েছে, এখানে তার প্রত্যনুবাদ করা হয়েছে। প্রাচ্য আখ্যায়িকাকে পাশ্চাত্য পাঠকের উপযোগী করতে শিল্পী তার কি রকম আকার দেন,—এবং আমাদের দেশের পুরানো গল্প বা তার নকল সমুদ্রপারের মানসলোকের নানা ভাষার ভিতর দিয়ে ঘুরে যখন আবার আমাদের ভাষার মধ্যে ফিরে আসবার সুযোগ পায়, তখন তার কেমন মূর্ত্তি হয় পাঠককে তাই দেখতে দেওয়া গেলো।)

—সম্পাদক

ধূলির ধরণীর মহাসত্য

— গল্প —

—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

আর একটা বাঁক্ ঘুরতেই নৌকাখানি পেছনের ঝোপ-জংলা পার হয়ে খোলা মাঠে এসে পড়্লো। ছোট্ট খাল এতক্ষণ ছিলো বন-বাদাড়ে ঢাকা·····নিবিড় অন্ধকার ঘেরা। এবার দেখা দিলো উন্মুক্ত জল-ভরা মাঠ.....চারিদিকে নীল জল ছল্ ছল্ করছে.....শুক্লা সপ্তমীর জ্যোছ্না ঝিল্ মিল্ করছে তার বুকে।

চোখ ফিরিয়ে আনন্দ বল্লোঃ—তারপর ? বৈঠা চালাতে চালাতেই উত্তর দিলামঃ তারপর হ'তেই উদয় কেমন পাগ্লাটে ধরণের হ'য়ে উঠ্লো। আড্ডা ছিলো যার প্রধান সম্বল, সেই হয়ে পড়্লো নিতান্ত একলা মানুষ,—নির্জ্জনে একলা বসে থাকে, আকাশের নীল-বুকে চোখ্ রেখে। মাঝে মাঝে আপ্না হ'তেই শিউরে উঠে ভীতচোখে চায় চারিদিকে। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম থেকে চীৎকার করে ওঠেঃ কিছুতেই যাচ্ছেনা ত.....উঃ কি ভয়ঙ্কর রক্ত.....শীগ্গির ধুয়ে ফেলো.....ওই বিলের নীলজলে ধুয়ে ফেলো—

বিধবা মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেঃ কি হয়েছে বাবা, কেন অমন কর্ছিস্ ?

উদয়ের সম্বিত ফিরে আসে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। চোখ দিয়ে ওর জল ঝরে অবিরাম, কাঁদ্তে কাঁদ্তে ও বলেঃ এত পিশাচ যে কেমন করে আমি হতে পার্লাম মা !.....তুমি যদি দেখ্তে মা তিনু ঘোষালের সেই বিকৃত আকৃতি.....সমস্ত শরীর রক্তে লাল.....ওঃ ! কিন্তু মা খুবই ত ভাল আমি ছিলাম...কারো চোখে এক ফোঁটা জল দেখ্লে আমার বুকে যে কত আঘাত লাগত,—সেই আমি কেমন করে এক নিঃসহায় বৃদ্ধের গায় অস্ত্র তুল্লাম—

ঘ-স্-স্ শব্দ করে নৌকা একটা চড়ায় ঠেকে গেলো। বৈঠাতেই মাটী নাগাল পাওয়া যায়। তবু অনেক চেষ্টাতেও নৌকা আর চল্লো না। অগত্যা আনন্দ

জলে নেমে গলুই ধরে হিড্ হিড্ করে টেনে নিয়ে চল্লো নৌকা, তারপর আবার বেশী জলে পড়েই নৌকায় উঠে বসে এগিয়ে চল্লো।

ম্লান হ'তে হ'তে সপ্তমীর চাঁদ এবার ডুবে গেলো অনেক দূরের তালগাছগুলোর পিছনে। অন্ধকারের কালো ডানা ঘিরে এলো পৃথিবীর হাসি-ভরা মুখে...মানুষের অনেক সুখের পরেও এমনি করে চিরকাল নেমে আসে ব্যথা ও ব্যর্থতার কৃষ্ণ-যবনিকা.....

আনন্দ বল্লোঃ চাঁদ যে ডুবলো রে নারাণ। খাল বেয়ে ঘুরে যেতে যে রাত হবে অনেক। তার চেয়ে চল্না জলো মাঠ ভেঙ্গে সোজা এগিয়ে যাই বাড়ী ?

আমি মাথা নাড়্লাম। বৈঠা রেখে আনন্দ লগি হাতে নিলো। খস্—খস্ শব্দ কর্তে কর্তে নৌকা ধানখেতের ভিতর দিয়ে পাড়ি ধর্লো। ওর প্রশ্নের উত্তরে আমি বল্তে লাগ্লাম্ সেই ব্যথাতুর কথা—কেমন করে উদয়-সূর্য্য একদিন —এই সেদিন—ঢলে পড়্লো অস্তাচলের বুকে বড় অকালে !

চৈত্র-সংক্রান্তিতে নৌকা-বাইচ্ হবে রণকালীর চরে। লোক জমেছে অগণন। মস্ত লম্বা তিনখানা নৌকা বাঁধা রয়েছে পাশাপাশি মাঝ্-নদীতে। সব নৌকাতেই লাঠিধারী সব লোক.....বাজ্নার তালে তালে পা চালিয়ে লাঠি খেল্ছে...আর সমস্বরে চীৎকার কর্ছেঃ হেই—ও ! সব নৌকারই দুপাশে ষাট সত্তর জন সমান তালে বৈঠা চালাচ্ছে—ছপ্ ছপাত।

পল্লীর অনেক লুপ্তপ্রায় উৎসবের মধ্যে নৌকা-বাইচ্ প্রধান। তার ভিতর দিয়ে আজ্কের নিঃস্ব পঙ্গু জাতির বুকে একদিনের জন্যও জাগে তার অতীতের শক্তি সামর্থ্যের স্বপ্ন-কাহিনী···একদিনের জন্যও তার হিম ঠাণ্ডা বুকের তলে রক্তের উদ্দাম স্রোত বয়···একদিনের জন্যও সে জাগে...

বাইচ্-খেলা সুরু হতেই দুই নৌকায় লাগ্লো ধাক্কা ; গণ্ডগোল বাধ্লো, ক্রমে লাঠি চল্লো ; শেষে সড়্কি ও বর্শা, সে এক তুমুল কাণ্ড...

তারি এক নৌকার সর্দ্দার ছিলো তিনু ঘোষালের ছেলে অবিনাশ। মাথার ঝাঁক্ড়া চুল দুলিয়ে সড়্কির প্যাঁচ্ দেখিয়ে এতক্ষণ সে খুব বাহাদুরী নিচ্ছিল।

কিন্তু সত্য যুদ্ধ যখন বাধ্‌লো, তখন সে আগে হতেই ছোট্ট একখান্ নৌকা নিয়ে তীরের দিকে ছুট্‌লো।

কিছুদূর চলে আসার পরই বিপক্ষদলের চোখ পড়্‌লো তার উপর। তারাও কয়েকজন ওর অনুসরণ কর্‌লো।

দুই নৌকায় দাঙ্গা বাধ্‌লো তীরের খুব কাছে।

সেখানেই নৌকা বেঁধে উদয় ও আরও কয়েকজন বাইচ্ দেখ্‌ছিলো। ওদের নৌকার সাম্‌নেই সড়্‌কি চল্‌ছে দেখেই উদয় নৌকা নিয়ে পালাতে যাবে, এমনি সময় ওর চোখ পড়্‌লো অবিনাশের ভয়ার্ত্ত মুখে, ওর মনে পড়্‌লো আর একখানি ভয়ার্ত্ত মুখের ছবি—তিনু ঘোষালের—

বিপক্ষদলের একজন সড়্‌কি তুলেছে অবিনাশের বুক লক্ষ্য ক'রে, এখনই সব শেষ—

হাতের লগি তুলে যন্ত্রচালিতের মত উদয় আঘাত কর্‌লো লোকটির মাথায়। অপ্রত্যাশিত আঘাতে লোকটা আর্ত্তনাদ করে জলে পড়্‌লো ঢলে। কিন্তু তার ক্রুদ্ধ সঙ্গীরা ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত উদয়কে কর্‌লো আক্রমণ.....উদয়ের রক্ত-রাঙা দেহ ডুব্‌লো মৃত্যুর নীলজলে.....

উপরে আঁধার আকাশ-নিস্তব্ধ.....মানুষের অনেক দুঃখে মূক কবির মত...

নীচে দুটি স্তব্ধ প্রাণী.....তাদেরি এক অতিপ্রিয় সঙ্গীর বিরহ-ব্যথায় বাক্-হারা···

নৌকা চলেছে ধানখেত ভেঙ্গে। ধানগাছগুলি মাথা নুইয়ে পথ করে দিচ্ছে। তারি শিহরণ লাগ্‌ছে গায়। পোকামাকড় উড়ে গায়ে পড়্‌ছে। রাতজাগা পাখী ডাক্‌ছে অনেক দূরে দূরে।

মন আমার বড় উন্মনা। বর্ত্তমানের গণ্ডী পেরিয়ে সে ছড়িয়ে পড়্‌লো অতীতে। আমার বড় আপনার ছিলো উদয়, আমাদের দুটি প্রাণ ছিলো কালের পথের পাশাপাশি যাত্রী। ও ছিলো সূর্য্যোদয়ের মতই উদার.....উজ্জ্বল। আমাদের ছোট্ট

পল্লীর আশেপাশের অনেকেই জানে ওর দরদী অন্তরের কথা: শোকে দুঃখে সান্ত্বনার বাণী শোনাবার...রোগে সেবা করবার···নিঃস্বকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে সুখী করবার...উদয়ের প্রাণে ছিলো অদম্য প্রেরণা ও সামর্থ্য।.....অন্তর ছিলো ওর মধুময়...ততোধিক মহনীয় হয়েছিলো সে অন্তরসম্পদ শিক্ষার পরশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি কোঠা ও পার হয়েছিলো। তবু বিরাট বিশ্বের রথযাত্রায় ওর স্থান হয়নি। ও ছিলো বড় গরীব···বাপের দারিদ্র্যই ওকে রাখ্‌লো অনেকের নীচে।.....কিন্তু আজ যখন ও নাই, তখন ওর স্মৃতির ছবি আছে সবারই প্রাণের মণিমন্দিরে যারা ওর সাহায্য ও সাহচর্য্য পেয়েছিলো ওর স্বল্প জীবনকালের মধ্যেই।.....

এম্‌নি অনেক ছবিই জাগ্‌ছিলো স্মৃতির পর্দ্দায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকালাম সাম্‌নে। শুধু অন্ধকার! মাঝে মাঝে গৃহস্থের দু একটি সন্ধ্যাপ্রদীপ মিটি মিটি হাস্‌ছে.....অনেক দুঃখের দিনে দুটি দরদী কথার মত.....

একটু ডাইনে চোখ ফিরাতেই চোখে পড়্‌লো পুরাণো বটগাছটা. অনেক দূরে চুপ করে বসে আছে রহস্যের চাদর মুড়ি দিয়ে। একটা হঠাৎ আঘাতে চল্‌তি চিন্তার সূতো গেলো কেটে: আজকের এই আঁধার আকাশ আর আঁধার পৃথিবী...ধানের খেতের ভিতর দিয়ে নিরর্থক চলা...অন্ধকার প্রান্তরের এই লঘু স্পষ্টতা,...সব মিলে মনের সামনে এনে ধর্‌লো এম্‌নি আর একটি রাতের বিভীষিকা চিত্র: একটি সত্যিকারের মানুষের সকরুণ পাশবিক পরিণতি..... আপনমনেই উত্তেজনায় আমি চীৎকার করে উঠ্‌লাম: ঠিক্ ওই বুড়োবটের নীচে বেতের জঙ্গলের তলেই—

আনন্দ এবার লগি তুলে বল্‌লো: জঙ্গলের তলে কিরে নারাণ? তেমনি ভাবেই উত্তর দিলাম: তা তোরা জানিস্‌না, জগতের আর কেউ যা জানে না, সেই রহস্য।

আনন্দ নিঃশব্দে লগি তুলে আবার নাম্‌লো, কিন্তু কোন প্রশ্ন কর্‌লোনা— আমার বল্‌বার সুর ওকে বিস্মিত করেছে। আমি বল্‌তে লাগ্‌লাম।

গেলো ভাদ্রমাসের এমনি এক রাত। আমি একাই সেদিন ফিরছিলাম ওই

বুড়ো বটগাছের নীচ দিয়ে। জানিস্‌ত—লগি আমি ভাল বাইতে পারি না, কারণ অনভ্যাস, তাই বিরক্ত মনেই চল্‌ছিলাম।

হঠাৎ মনে হলো—বটের তলের বেত ঝোপ্‌ হতে যেন একটা শব্দ এলো—"এই বার মুক্তি"—

গলার অস্বাভাবিক স্বর আমায় চকিত কর্‌লো। নৌকার মুখ ফিরিয়ে দিলাম ঝোপের দিকে! অজানা আশঙ্কায় বুক দুর্‌ দুর্‌ করে উঠ্‌লো, তবু সে অজানার আকর্ষণে এগোলাম, নিঃশব্দে এগিয়েই দেখি—একটা লোক যেন দেহের সমস্ত শক্তি এক করে একটা ভারী জিনিষ ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে জঙ্গলের ভিতরে।

আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। তবু হাঁক্‌লাম ঃ কে ওখানে? চোখের সাম্‌নে নিজের প্রেতমূর্ত্তি দেখ্‌বার মত লোকটি চম্‌কে দাঁড়ালো,...প্রাণপণে আড়াল কর্‌লো সেই বস্তুটা।...পর মুহূর্ত্তেই আমার নৌকার উপর এসে আছ্‌ড়ে পড়ে বল্‌লো ঃ নারাণ—তুই?

লোকটি উদয়। বিরাট বিস্ময় আমার গলা চেপে ধর্‌লো, আমি চুপ্‌ করে রইলাম। ওই বল্‌লো ঃ হিংসা আমাকে আজ পশু করেছে নারাণ—

আমি চম্‌কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ কিন্তু, কি কর্‌ছিলি তুই? ওটা কি?

ভয়কম্পিত কণ্ঠে ও উত্তর দিলো, চোখ দুটি বিস্ফারিত করে ঃ মরা লাশ!

আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেলো ঃ লাশ? কার?

এবার ওর স্বরে একটা হিংস্র কুটীলতা ঃ তিনু ঘোষালের।

বুঝলাম সব, প্রায় ছ' মাস হয়, ওই তিনু ঘোষালের দেনার দায়ে উদয়ের বুড়ো বাপ জেলখানাতেই মারা গেছে। তারি এ প্রতিশোধ, কিন্তু কেমন করে এ সম্ভব হলো! ওই আড্ডাবাজ্‌, সরল, দয়ার অবতার ছেলেটি কেমন করে এ শয়তান-বৃত্তি অবলম্বন কর্‌লো!

ওর দিকে চাইলাম। জলের ভিতর দাঁড়িয়ে নৌকার গলুই ধরে ও দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত।.....ওর বিচিত্র দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখে আমার সব সাহস বরফের মত গলে গেলো...একি সত্যি মানুষ না আর কিছু। ভূতের অন্ধ ভয় আমার ছিলো না, তবু জিজ্ঞাসা কর্‌লাম ঃ উদয় তুই?—সত্যি আমি। জানি তোরা এ বিশ্বাস

কর্‌তে পারবি না, কারণ এ রূপ আমার সম্পূর্ণ উল্টো, তবু যা ছিলো আমার পক্ষে সবচেয়ে অসম্ভব, তাই আজ হয়েছে সম্ভব—এই জগতের নিয়ম।

তারপর অসহায়ভাবে বল্‌লো ঃ জানি নারাণ, এর ক্ষমা নাই। তবু যদি জান্‌তিস কেন আমি এমন হয়েছি, তাহলে হয়ত তুই অন্ততঃ আমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌তিস।

আমি বল্‌লাম ঃ জানি সব।

উন্মত্তের মত ও জবাব দিলো ঃ না, জানিস্‌ না তুই কিছুই। ভাবছিস—দেনার দায়ে বাবা জেলখানায় পচে মরেছে, তাই আমি তার প্রতিশোধ নিলাম, ওকে বেতের নীচে পটিয়ে; কিন্তু তা নয়, আর তাই যদি হ'ত তবে ক্ষমা আমি চাইতাম না—

উদয় উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগ্‌লো। ওর অসহায় ভাব আমার প্রাণে লাগ্‌লো। হাত ধরে নৌকায় তুল্‌লাম ওকে। ও বল্‌তে লাগ্‌লো।

কেমন করে দীর্ঘ দশ বছর আগে—ও তখন স্কুলে পড়ে—ওরই বিয়েকে কেন্দ্র করে একটা বিষ-ভাব গড়ে ওঠে ওর বাবা আর তিনু ঘোষালের মধ্যে। তিনু ঘোষাল জাতে ছোট, তাছাড়া সুন্দরী হলেও মেয়ে শিক্ষিতা নয় মোটেই, ওর বাবা তাই বিয়েতে রাজি হননি। ক্রমে কথায় কথায় রাগারাগিতে দাঁড়ালো। রাগের মাথায় ওর বাবা এক সময় বলে ফেল্‌লো ঃ নিজের যার কুল মান নাই, তার ঘরে কোন কাজ সে করতে পারে না। কথাটা সত্য। তিনু ঘোষাল এক বৈষ্ণবীর পালিত পুত্র। বৈষ্ণবীর কিছু টাকা পয়সা ছিলো, ঘোষালেরও ছিলো বিষয় বুদ্ধি,—দুয়ের মিলনেই তিনু ঘোষাল আজ এ তল্লাটের নামকরা লোক, নিজের অতীত দুর্নামের প্রতি এই উলঙ্গ ইঙ্গিতে তিনু ঘোষালও তাই জবাব দিলো ঃ আচ্ছা—তোমার এ কুলের বাহাদুরী আমি ভাঙ্গবো।.....

সেই হতেই রেশারেশি। সুযোগও এলো। কিছু টাকা ওর বাবা সত্যি ধার্‌তো তিনু ঘোষালের কাছে। তাই চক্রবৃদ্ধিহারে অনেক সংখ্যায় উঠ্‌লো, তিনু ঘোষালের লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়তির পথেই চল্‌লো।

তার পরই সুরু হলো মামলা। ব্যথিত কণ্ঠে উদয় বল্‌তে লাগ্‌লো ঃ তোরা জানিস্, বাবা তখন বার্দ্ধক্যে ও রোগে এক রকম শয্যাশায়ী, আর আমিও এমন কিছু নই যে মামলা চালাবো। তিনু ঘোষালকে তাই ধর্‌লাম আপোষের জন্য, সে স্বীকৃত ত হলোইনা, উল্‌টে অনেক কথাই আমায় শুনিয়ে দিলো। আমি নিঃশব্দে বাড়ী এলাম।.....

তারপর নারাণ, মনে পড়ে বাবাকে যেদিন নিয়ে যায় জেলে। মা ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে কাঁদ্‌ছে...বাবার দুচোখ বেয়ে জল ঝর্‌ছে অবিরাম, তবু বিরাট স্তব্ধতার সাথে লাঠি ভর দিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে তিনি পাল্‌কীতে উঠ্‌লেন! তিনু ঘোষালের পায়ে ধরে সেদিন বলেছিলাম—আমাদের বাস্তুভিটা হতে যথাসর্ব্বস্ব নিয়েও বাবাকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু ফল্গুর কাতর প্রার্থনায় মরুর বুক হতে তো শান্তিবারি ঝরে না.....

পাল্‌কী উঠ্‌লো।

বাবা ডাক্‌লেন ঃ উদয়—

পায়ের ধূলো নিয়ে আমি দাড়িয়ে রইলাম.....কানে বাজ্‌তে লাগ্‌লো পাল্‌কী চলার সুর.....

সেই হতেই মন আমার বিষিয়ে উঠ্‌লো। অনেক চেষ্টা কর্‌লাম মনকে বোঝাতে যে পাওনাদার যেমন ভাবে হোক তার পাওনা আদায় করে নেবেই তাতে দেনাদারেরত অসন্তুষ্ট হওয়া চলে না। কিন্তু ভাই, কিছুতেই মনকে ফিরিয়ে আনতে পার্‌লাম না.....একটা হত্যা বিভীষিকা আমায় পাগল করে তুল্‌লো..... মন বল্‌লো ঃ এই পথেই তোর পিতৃঋণের মুক্তি.....

তারপর এলো বাবার মৃত্যু সংবাদ, অনেক কষ্টে মৃতদেহ এনে সৎকার কর্‌লাম...শেষ মুহূর্ত্তে যার মুখে দিতে পারিনি এক বিন্দু জল, তারি মুখে পুত্রের দাবী নিয়ে জ্বালিয়ে দিলাম অগ্নি-প্রবাহ...উদয়ের গলা ভিজে উঠ্‌লো। হাত দিয়ে চোখ মুছেই ও বল্‌লো আবার ঃ সেই হতেই একটা পিশাচ আমায় টেনে নিয়ে চল্‌লো অবিরাম, আমার নিজকে ধরে রাখবার সব ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেল্‌লাম। প্রেতের মত ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লাম সুযোগের অপেক্ষায়।...

সেই সুযোগ আজ মিলেছে—সুদীর্ঘ ছ' মাসের উৎকণ্ঠ অপেক্ষায়.....তাই তোদের একটা প্রিয়সাথী আজ হত্যাকারী পিশাচ—

কিছুক্ষণ সব চুপ.....বেতবন হতে ঝিঁঝিঁ ডাক্‌ছে.....মাঝে মাঝে বটের ফল পড়্‌ছে জলে টুপ্ টাপ্ করে।...একটা হিমশীতল বাতাসে চমক ভাঙ্গলো। উদয় এক লাফে নৌকা হতে নেমে লাশটাকে আরও ঠেলে দিলো.....কোন চিহ্নই আর তার রইলো না। তারপর নৌকায় উঠে লগিতে ঠেলা দিলো আর বল্‌লো ঃ আমার এ কীর্ত্তির তুই ই একমাত্র সাক্ষী নারাণ।

আমি ডাক্‌লাম খুব আস্তে, জোরে ডাক্‌তে আমার গলার স্বর বেরোলোনা ঃ উদয়—শোন্—শোন্—

ও তীব্র গতিতে এগিয়ে যেতে যেতে বল্‌লো ঃ ভাবিস্ না মর্‌তে ভয় পাই বলে তোকে মিনতি জানাচ্ছি। তবে আমার জীবনের যে সহজ সরল ছবি আমি এঁকেছি তোদের প্রাণপটে, তার উপরে এত বড় একটা কলঙ্করেখা টেনে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, তাই—

ওর কথা আর শোনা গেলো না। শুধু একটা আবছা মূর্ত্তি দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো।...আমিও নৌকা ছেড়ে দিলাম। বেতের গাছগুলি বাতাসে কাঁপতে লাগ্‌লো...জীবন্ত ভয়ের মত...

এতক্ষণে আমাদের নৌকা ধানখেত ছেড়ে পরিষ্কার জলে এসে পড়েছে। পেছনে ফিরে চাইলাম ঃ সেই বুড়ো নট আঁধারে আবছা ঢাকা হয়ে গেছে।

আনন্দ এবার কথা বল্‌লো ঃ কিন্তু এ কথা ত আমরা জানিনি এতদিন। সেই যে এক ভাদ্র-রাতে তিনু ঘোষাল অদৃশ্য হয়ে গেলো—সবাই দৃঢ় ধারণা কর্‌লো নলপুরের চর নিয়ে যে দাঙ্গা বেধেছিলো তার ঠিক আগেই, তিনু ঘোষাল আর আটঘরের রহিম সর্দ্দারের সাথে, তারি এ ফল।.....কিন্তু উদয় যে—

বাধা দিয়ে আমি বল্‌লাম ঃ শুধু তোমরা কেন, উদয়কে যারা জান্‌তো, একথা ভাব্‌তেও পারে না তারা কোন দিন। এতখানি সরল মধুর ছিলো ওর চরিত্র ; অথচ

সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে সেই হলো এত নিষ্ঠুর...এত বীভৎস।......চারদিক নিঝুম। জমাট আঁধার যেন চেপে ধরছে আমাদের দুটি প্রাণীকে। একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে আমি বল্লাম আবারঃ তবু আনন্দ, সেই রাত হতে রণকালীর চরে ওর শেষের দিন পর্য্যন্ত কত সতর্কতার বেড়া দিয়েই যে ওকে আমি ঘিরে রেখেছি; কারো সাথে মিশ্‌তে দিইনি বেশী, সদাসর্ব্বদা ওকে রাখ্‌তাম নিঃসঙ্গ এক্‌লা। ছবি আঁক্‌তে ও খুব ভালবাস্‌তো, তুই জানিস্‌, তারি নেশায় ওকে রাখ্‌তাম আবিষ্ট। শেষের দিকের আঁকা ওর কয়েকখানি ছবি আছে, তোকে একদিন দেখাবো। শুধু কয়েকখানি মুখঃ হত্যাকারীর ও হতভাগ্যের...কি করুণ সে অভিব্যক্তি......প্রতি রেখা যেন ও টেনেছে বুকের রক্তে......

......নৌকা চল্‌তে সুরু করেছে আবার জংলাঢাকা সরু আঁধার খালের বুক বেয়ে। দুপারের গাছগুলি সর্‌ সর্‌ করে পিছনে সরে যাচ্ছে।

আনন্দ একাই চলেছে বেয়ে। বৈঠা ধরবার মত মনের অবস্থা আমার নাই। আজকের এই ঝিঁঝিঁ ডাকা আঁধার রাতে উদয়ের স্মৃতি যেন আমার দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে দিলো...দেহের প্রতি রক্তবিন্দু যেন ওর স্মৃতি ভারে অবসন্ন।

কেন জানি না উদয়কে আমি আজও ভুলতে পারিনি একটুও! ও যা করেছে, তা ন্যায় কি অন্যায়, আজও আমি তা স্থির করতে পারিনি; হয়ত এ ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠির বাইরে...যা ও করেছে, তাছাড়া অন্য কিছু ও পারত না করতে শত চেষ্টায়ও...

তবু আজ শুধু ভাব্‌ছি কেন এমন হয়ঃ সুন্দর মানুষ আসে পৃথিবীতে...... আকাশের মত সে উদার...সূর্য্যের মত অবারিত। কেন ধূলির পৃথিবীতে চল্‌তে চল্‌তে সে হয় কৃপণ, কুটিল, কুৎসিৎ, ভয়ঙ্কর।...

আজ বারবারই মনে হচ্ছেঃ ধূলির ধরণীর এ অনিবার্য্য পরিণতি...তরুণ সুন্দর দিনের এখানে বীভৎস অমানিশাতেই হয় চির-পরিণতি...বড় ব্যথাতুর হলেও —মহাসত্য।...

হরিজন

– প্রবন্ধ –

—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বে যে কালে ভারতে আমিশ্র হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ছিল, তখন দেশে শুদ্ধ, সঙ্কর, ও অন্ত্যজ এই প্রকার শ্রেণী বিভাগ ভারতের জনসমাজে দেখিতে পাওয়া যাইত। সমাজের পশ্চাতে পরাক্রান্ত সধর্ম্মী রাজশক্তি সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করিত; উদারতার মিথ্যা আবরণের অন্তরাল হইতে দুর্ব্বলতা শাসন কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করিত না। দোষী দণ্ডিত হইত তদ্দৃষ্টে কেহ সমাজ বিধানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচার চালাইবার কল্পনাও করিতে সাহস করিত না। যে কারণেই হউক সে দিন নাই সমাজের বিধি ব্যবস্থাতেও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। পরিবর্ত্তন সাধন অবস্থানুযায়ী হইলেও মূল আদর্শের কোন ব্যত্যয় হয় নাই। ফলে আজিও সেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের আদর্শেই হিন্দু সমাজ বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিদ্রোহ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে।

বহিরাক্রমণে শক্তি ক্ষয় হইলেও শক্তির পুনরুদ্ধারের আশা থাকে কিন্তু যেখানে অন্তর্বিদ্রোহ বর্ত্তমান সেখানে শক্তিলোপ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় শক্তি চির তরে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে অন্তর্বিদ্রোহের ফলে। এই বিদ্রোহ দমনের উপায় নাই পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী জাতির এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা সর্ব্বনাশের নামান্তর। এই সর্ব্বনাশ ভারতবাসী প্রতি মুহূর্ত্তে ডাকিয়া আনিতেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই সর্ব্বনাশ আমন্ত্রণের দৃষ্টান্তের অন্ত নাই। তাহার পুনরুল্লেখের ও আবশ্যক দেখি না। তবে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন নিয়ন্ত্রণের নাম করিয়া বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে যে অবস্থাকে আমরা আত্মকলহের দুর্য্যোগের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি, তাহার ফল আরও কতক পুরুষ ধরিয়া ভোগ করিতে হইবে। এই দেশের সমাজ সংস্থানের দোষ দেখাইয়া তাহার সংস্কারের চেষ্টায়

মহামানবের প্রায় প্রতিদিন এ দেশে আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু যুগমানব মহামানব এমন কি অবতারের আবির্ভাব ঘটিয়াও সংস্কারের আশা ক্রমশঃ দূর হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানেও আমরা এই অবস্থাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। শাস্ত্র, দেশাচার ও লোকাচারের নির্দ্দেশে এই দেশে স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মধ্যে যে ভেদ ছিল তাহা দুই একটী প্রদেশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ইহার মূলে প্রথমে বিদ্বেষের ভাব থাকিলেও একত্র জীবন যাপনের ফলে সেই বিদ্বেষ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ব্যক্তিগত বিদ্বিষ্ট ভাব কোন ক্ষেত্রে দেখা গেলেও বিদ্বেষের ব্যাপকতা নিঃশেষে দূর হইয়া গিয়াছিল। এই জাতিবৈষম্য দূর করিয়া সমগ্র দেশের হিন্দুজাতির একত্ব সাধনের সুখস্বপ্নে অর্দ্ধ জাগ্রত জাতি লুপ্তপ্রায় জাতিবিদ্বেষকে পরস্পরের প্রতি অযথা অভিযোগ প্রয়োগ করিয়া পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন, বর্ণাশ্রমের রূপান্তর জাতিভেদ আজ তৃতীয় আকার গ্রহণ করিল হরিজন ও বর্ণ হিন্দু আখ্যায় অভিহিত হইয়া। পূর্ব্ব হইতে এক শ্রেণীর পরিবর্ত্তন বিরোধীর অস্তিত্ব ছিল, তাহারা পরিবর্ত্তনের বাহাদুরীর লোভে পরিবর্ত্তন চাহে না বলিয়া অন্যায় ভাবে আক্রান্ত হইয়া দেশের সকল প্রকার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া গেল, দেশের দুর্দ্দশা মোচনের ভার গ্রহণ করিল এমন এক দল যাহারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচারে, ব্যবহারে এমন কি মনে ও পরদেশী। বৈদেশিক শিক্ষায় নিজদেশের সকল বিষয় তাহাদের চক্ষে হেয় ও অবজ্ঞেয় সুতরাং তাহারা আপনাদের শিক্ষা ও মার্জ্জিত রুচির অহঙ্কারের উচ্চ বেদি হইতে এক দিকে সংস্কার প্রচার ও অপর দিকে স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ ও সর্ব্বোপরি স্বজাতির নিন্দাবাদে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। দেশ এক হইতে গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

দিন কয়েক হইতে এক শ্রেণীর সমাজসেবী হরিজন সেবায় উৎকণ্ঠ হইয়াছেন। হরিজন আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত গান্ধিজীর তাহারা ভক্ত, তাঁহার স্বরাজ সাধনায় অনেকে একদিন সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহার কল্পিত স্বরাজ লাভের পথে যে সাধনার আবশ্যকতা তাহার অনুষ্ঠান দুঃসাধ্য বুঝিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হরিজনোন্নয়নের চেষ্টায় তাহাদের সহিত পার্থক্য অক্ষুন্ন

রাখিয়া রূপান্তরে তাহাদিগের স্পৃষ্ট অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করিয়া হরিজনদিগকে কৃতার্থ এবং আপনাদিগকে অতিমানুষবোধে গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন।

হরিজনের উদ্ধগমন সম্ভব বিনা সে প্রশ্ন সমাধানের অবসর নাই কারণ যে কার্য্যের মূলে সদুদ্দেশ্য নাই তাহার সম্বন্ধে সাধ্যাসাধ্য চিন্তা কে করিবে? ফলে হরিজনের উন্নয়ন কল্পে দুইটী উপায় দেখা যায়। প্রথমটী সমাজের উচ্চ-শ্রেণী এবং বর্ত্তমানে বর্ণ হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ প্রচার, এবং দ্বিতীয়টি তাহাদের সহিত সময়োচিত পান ভোজন। প্রথমটীতে আংশিক আন্তরিকতা যদি বা থাকে দ্বিতীয়টীতে একমাত্র বাহাদুরী ভিন্ন অপর কিছুই নাই। সুতরাং সাময়িক আবেগে আজ যে হরিজনের সহিত পান ভোজন করিয়া ধন্য হইল ভবিষ্যতে সে ব্যক্তি হয়ত এই অনুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিয়া বাচনিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিবে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—প্রায় সকল ক্ষেত্রেই যাহারা বহুকাল হইতে এমন কি পুরুষানুক্রমে পান ভোজনে জাতি বিচারের এবং খাদ্যা-খাদ্য বিচারের সংস্কার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে হরিজনের সহিত একত্র ভোজনে তাহারাই প্রধানতঃ অগ্রণী। হরিজনের উদ্ধগমন যদি এই দুই কার্য্যের অনুষ্ঠানেই সম্ভব হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে হরিজনদিগের উন্নতির আশা বহু দূরে।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই অসাধ্য সাধনের ব্যর্থ প্রয়াসের সাক্ষ্যের অন্ত নাই। সুদূর অতীতে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত পরম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে কয়েকশত বৎসর ধরিয়া ইহার চেষ্টা হইয়াছিল। অশোক, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি সম্রাটগণের রাজশক্তির সহায়তায় বহুল প্রচার হইয়াও তাহার অস্তিত্ব আজ ভারতের কোথাও পাওয়া যায় না। এমন কি সামাজিক আচারের বিলোপের সহিত মূলগত ধর্ম্ম অবধি এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

তৎপরে খড়্গপানি ইস্‌লামের প্রবল আক্রমণ। পাঁচশত বৎসরের উৎকট ধর্ম্মান্ধতা দুঃসহ অত্যাচার ও বৈবাহিক আদান প্রদানের ফলেও ভারতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন সনাতন ধর্ম্মীর অবস্থার কোন ইতর বিশেষ হইল না তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

রামানুজ নানক কবির প্রভৃতি কত অবতারোপম মহাপুরুষের অনুচর ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজের শৃঙ্খলায় আঘাত করিয়া মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিষয়ে সাময়িক বা স্থায়ী ভাবপ্রবণতার দুর্ব্বলতা প্রকাশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আপন স্বার্থ সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিবার বহুল প্রয়াস করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এক ভারতে সংস্কারকের এবং তাহাদের ভক্ত অনুচরের ভ্রান্ত পরিচালনায় ভাবান্ধ সাধারণ ভারতবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শোচনীয় বিদ্বেষ টানিয়া আনিয়া পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের 'কসরৎ' প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত। হরিজন তখন ও যে স্তরে ছিল কোন প্রচারে বা সংস্কারপন্থীর বিরুদ্ধাচরণে আজিও তাহার অবস্থান্তর ঘটে নাই। ভারতের হিন্দুসমাজ তাহার প্রাচীন বর্ণাশ্রমের আদর্শ কোন প্রতিকূল আন্দোলনেই ত্যাগ করিতে পারিল না ভবিষ্যতেও পারিবে কিনা সে কথা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

সাধারণ ভারতের কথা ছাড়িয়া আমাদের বাঙ্গালা দেশের কথা আলোচনা করিলে দেখিতে পাই এই দেশের অবস্থা ভারতের অপরাপর প্রদেশের তুলনায় প্রায় অভিন্ন। বর্ণাশ্রমের আদর্শ এখানেও অব্যাহত। তবে এই দেশে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা অবস্থান্তরকে বরণ করিয়া লইতে অতি মাত্রায় ব্যস্ত! বৌদ্ধযুগের বঙ্গদেশ নাকি এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে বেদ—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য ব্যক্তির এদেশে একান্ত অভাব হওয়ায় পশ্চিম হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের প্রয়োজন ঘটে। আপন বৈশিষ্ট্য অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে এমন উদারতা বাঙ্গালা দেশে ভিন্ন কোন দেশে আছে কি না এই প্রশ্ন দেশ বিশেষাভিজ্ঞের আলোচনার বিষয়।

(ক্রমশঃ)

অব্যাহত

— গল্প —

—শ্রীমণিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এইমাত্র অণিমার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শ্রীপতি যেন বাঁচিল। এতক্ষণ যে অনির্দ্দিষ্ট বোঝাটা তাহার বুকে বিশাল একটা ভারের মত চাপিয়াছিল, সেটা নামিয়া যাইবে তবু। এখন একটু প্রাণ ভরিয়া নিঃশ্বাস লইতেও তাহার বাধা নাই। অণিমা এখন সুখ-দুঃখের বাহিরে গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে আবার ঠেলিয়া দিয়া গেল, নিত্য-কর্ম্মকোলাহল আর ব্যস্ততার মাঝে। অণিমা সুদূর বিদেশে মৃত্যুশয্যায় যে সুদীর্ঘ শেষনিঃশ্বাসটী ফেলিয়াছে, তাহাই যেন আবার তাহার বুক হইতে বাহির হইল, বহু তৃপ্তি, বহু অবকাশ লইয়া। একদিকে যে নিঃশ্বাস করিয়াছে নিঃশেষ, অন্যদিকে তাহাই যেন তাহাকে নির্ম্মুক্ত করিল।

এই কয় ঘণ্টা শ্রীপতির কাটিয়াছে একটা স্বপ্নের মধ্যে। অতি দুর্ব্বিসহ সে স্বপ্ন। চতুর্দ্দিকের জীবন যাত্রা হইতে তাহা তোমায় টানিয়া নিবে এক কুহেলীলোকে, দৈনন্দিন সাংসারিকতার মোহ হইতে তোমায় দিবে মুক্তি। কিন্তু মায়া—বাঁচিবার আর বাঁচাইবার মায়া—অন্তরাত্মার নিভৃততম অংশে গড়িয়া তুলিবে একটা আশঙ্কার ভার। তাহার প্রতি মুহূর্ত্তের অসহনীয় উপস্থিতিতে পাগল হইয়া যাইতে হয়—ইচ্ছা হয় সব কিছু ভুলিয়া এক তীব্র ধাবমান গ্রহের বেগে ছুটিতে।

অণিমার রোগের সংবাদ সে পাইয়াছে কাল রাত্রে। তখনই তাহার মনে হইয়াছে অণিমা বাঁচিবেনা। সারারাত তাহার কেমন করিয়া কাটিয়াছে তাহা সে জানে না। প্রতি মুহূর্ত্তের ইতিহাস কাল সে বিছানায় শুইয়া শুনিয়াছে—প্রতি মুহূর্ত্তে সে যে বাঁচিয়া রহিয়াছে এই অতি প্রত্যক্ষ সত্য তাহাকে সদাসর্ব্বদা পীড়া দিয়াছে। কাল মরিতে পারিলেই যেন তাহার পক্ষে ভাল হইত। অণিমার

সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্তিত্বও পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই—তাহাদের অস্তিত্বের কোঠায় শূন্য পড়িল না। আজ সকালে অণিমা নাই কিন্তু সে আছে—স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্নের ধ্বজা তুলিয়া ধরিবার জন্য যে তাহাকে বাঁচিতেই হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে কোনও অবিচার হইতে পারে না।

অণিমা নাই—এই দুটী কথা বিস্তৃত আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া শ্রীপতি নির্বিচারে স্বীকার করিল। ছোট্ট দুটী কথা—কিন্তু রূঢ় বাস্তবতার অতি প্রত্যক্ষ প্রতীক। হঠাৎ যেন শ্রীপতি নিজেকে ভয়ানক মুক্ত মনে করিল, তাহার শরীর এত হাল্কা। উন্মুক্ত স্বাধীন জীবন—মরুভূমির অবারিত রুক্ষ প্রসারণ লইয়া তাহার সম্মুখে পড়িয়া আছে। এই কয় ঘণ্টা যেন সে শিলীভূত হইয়াছিল—কিন্তু ছোট্ট সংবাদটী যেন তাহাকে প্রাণ দিয়াছে। মৃত্যুর উন্মোচিত রূপ যেন সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল—বুঝিতে পারিল বাঁচিবার সত্য আকাঙ্ক্ষা লুকাইয়া আছে মৃত্যুরই মধ্যে। আজকের শ্রীপতিকে লইয়া খেলা করা কত সহজ—কত বাধাহীন। আজকের এই স্বাধীন শ্রীপতিকে পৃথিবীতে কত সুন্দর দেখাইবে, পৃথিবীও তাহার চোখে লাগিবে কত ভাল। শ্রীপতি আজ এক বারও মরিতে চাহিবে না—মরিতে তাহার ইচ্ছা নাই।

জীবনে যদি তাহার অণিমাই আনিয়াছিল বন্ধন—সেই আনিয়াছে মুক্তি। সেদিনের সেই নীড়টির চেয়ে আজকের এই প্রান্তর তাহার ভাল লাগিবে কিনা তাহা সে জানে না—বিচারও সে করিবেনা; কিন্তু সেদিন যদি তাহার চক্ষে পৃথিবী ভাল লাগিয়াছিল—ভাল লাগিয়াছিল এই জীবন, আজ এখনও সে মুক্ত কণ্ঠে বলিবে বাঁচিতে চায়.....

"বাবু—" বাহির হইতে চাকর ডাকিল।

শ্রীপতিরও এক নিমেষে চমক ভাঙ্গিল। মাথাটাকে জোরে দুবার ঝাঁকানি দিয়া চেয়ারের হাতলে ভর দিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পৃথিবীর এই ডাক যেন তাহার এতক্ষণের সকল অলৌকিক শক্তি হরণ করিয়া লইয়াছে। শ্রীপতি উঠিতে পারিল না—বসিয়া পড়িল।—ধীরে ধীরে তাহার মাথা নত হইয়া হাতের মধ্যে আশ্রয় লইল। এইবার সে কাঁদিবে।

গান

—শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্য

সুরের বাদল নাম্‌ল প্রিয় আজকে তোমার একতারাতে,
মন-ময়ূরী লাগ্‌ল নাচে সুর-শাঙনের কাজলা রাতে।
কোন অলকার অলখ নাটে
তোমার লীলার ঝর্ণা গো,
ঝরছে অঝোর! নিখিল কানন
তাইতো সবুজ-বর্ণা গো!
অরূপ তোমার ছন্দ-হিলোল কাঁপন জাগায় মন-বীণাতে।

যে গান গেয়ে বনের পাখী দূর-পথিকের পথ ভুলায়,
মুকুল জাগার স্বপন আনে ফুল-কুমারীর চোখ ঢুলায়,
সে সুর শুনে নিঝর ধারার
পাষাণ মায়ার ঘুম টুটে,
নীল-সায়রের অতল তলে
আপন-হারা যায় ছুটে;
সে সুর জাগে রাতের চাঁদে ভোর-গগনের শুকতারাতে।

উন্মোচনীয়

—সম্পাদক

সকলে সহায় হোন্, মনের কবাট উন্মোচন করি। সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলবার যে শক্তি, মোহে যেন তা ক্ষুণ্ণ না করি। সত্যকে অতিরঞ্জিত করতেও চাই না, মিথ্যাকে আচ্ছাদন করতেও না। আমাদের একে একে সব যেতে বসলো, কিন্তু এখনও আছে আমাদের ভাষা—যা মানুষকে সাবধান করে, সংস্কৃত করে, অগ্রসর করে,—যা মানুষের অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করে, বিশ্বসংসারে যা সকলের উপরে স্থান পেয়েছে। যুগের পর যুগ যে বাণী দিয়ে মানুষ নিজেকে অক্ষয় করে রেখেছিল, আমাদের রিক্ত ভাণ্ডার থেকে সে বাণীটুকু এখনো অপহৃত হয় নি। আছে তো মাত্র এই বাণী, তাও আমরা প্রয়োগ করতে এত ক্ষুদ্রতা করি কেন? একটু যদি সত্য বলি তো তার অহঙ্কার কত, অলঙ্কার কত! উর্ব্বরতার সুযোগ পেয়ে গাছের চেয়ে আগাছাই জন্মেছে বিস্তর, ভিতরে সাপ লুকিয়ে আছে। কে কাটবে এই জঙ্গল? তরুণ প্রবীণের বাড়াবাড়ি অনেক হোয়ে গেছে, আর না। বয়েস দিয়ে কাজের বিচার কোনো কালে কি হয়েছে যে আজ হবে? আমরা সবাই তরুণ, অষীতিপর থেকে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত। কণ্ঠ যার অকম্পিত, জড়তা-হীন, দূরসঞ্চারি, বেগময়ী,—সেই তরুণ। আস্ফালনে তরুণ হয় না, তারুণ্য প্রকাশ পায় অভিব্যক্তিতে। তা কখনও হবে নির্ম্মল, কখনো মনোরম, কিন্তু কদাচ তা পাড়াদায়ক হবে না। এই আদর্শ নিয়ে আমরা অগ্রসর হলাম। বাগ্‌দেবীর পূজার দিন আমাদের জীবনের আরম্ভ। সকলে আপনারা প্রসন্ন হোন।

* * * * *

আমরা বর্ত্তমান,—এই আমাদের সংজ্ঞা। অতীতের স্পর্শপরম্পরা আর ভবিষ্যতের আয়োজন দুই-ই আমাদের মধ্যে, আমরা দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী। অতীতকে পায়ে দল্‌লেও তার স্পর্শ ঘোচাতে পারবো না, ভবিষ্যৎকে অপূর্ব্ব গড়তে চাইলেও তা'

গড়ে উঠবে না। দেশকে চাই নূতন গঠন দিতে। কিন্তু দেশ কি কেবল আমরা—যারা কিছু পড়ালেখা শিখেছি? যারা মাঠে লাঙল ধরে, মাথায় ঘোমটা টানে, যোগে পার্ব্বনে ভীড় ক'রে গঙ্গাস্নানে যায়, ঠাকুরের কাছে মাথা কোটে, বিপদ হোলে খোদার দোহাই দেয়, তারাই সংখ্যায় বেশী, এ সকলকে এক সঙ্গে নিয়ে তবে এই 'আমরা'। আমাদের ভবিষ্যৎ কি তাদের বাদ দিয়ে হবে! উচ্চারণ নেই বলে কি তাদের কোনো বোধ নেই, কোনো বাণী নেই? তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কৃত্রিম আবেষ্টনের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে কথা আমরা বলবো, তাই কি হবে দেশের ভাষা?

* * * * *

ঘটনার সমাবেশ ও ভাষার মোচড় দিয়ে জোরালো উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করা যায়,—যেমন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে পিচকারীর রং হাতের প্রবল চাপে। কিন্তু শীঘ্রই সে উচ্ছ্বাস ফুরিয়ে যায়। ঘটনাকে বাস্তবিকতা দিয়ে যদি ফেনিয়ে তোলা যায় আর মনের লোভকে যদি চিন্তার বাস্তবিকতা ব'লে জোর জোর কথা দিয়ে ফুটিয়ে তোলা যায় তাতে রচনার চমৎকারিত্ব থাকতে পারে বটে কিন্তু তা ক্ষণভঙ্গুর; তাতে মোহই আছে, আনন্দ নেই। কেবল বাস্তবজগৎ রচনা করলেই শিল্প হয় না। চেয়ে দেখুন পাশ্চাত্য শিল্পীদের দিকে, যারা আমাদের চেয়ে অনেক পথ অগ্রসর হয়েছে। শিল্পী বলে,—ফুলকে যতই হুবহু ক'রে আঁকো না, তাকে কেউ বাস্তব ফুল বলবে না, বলবে আঁকা ফুল। তখন ফুলের মত অবিকল ছবি আঁকার চেষ্টায় লাভ কি? ফুলের স্বরূপ আর আঁকতে যেও না, আঁকো ফুলের আনন্দ যা ফুলের ভিতর থেকে সকলের চোখে পড়ে না, তোমার তুলিতে সেই জিনিসটি ফুটিয়ে তোলো। পাশ্চাত্য শিল্পী এ কথা বুঝেছে তাই ক্রমে ক্রমে তার ছবি থেকে বর্ণ খসে পড়েছে, অলঙ্কার খসে পড়েছে।

* * * * *

সব চেয়ে সোজা কথা এই যে আমরা যা লিখবো তাতে আমাদের জাত বজায় থাকবে। প্রত্যেক মানুষের জাত আছে, তার লেখার মধ্যে কেন সেটা থাকবে না? যে লেখায় আমার দেশের মাটি লাগেনি, দেশের রং যাতে ধরেনি, দেশের রক্ত যাতে দেখা যাচ্ছে না, দেশের পাখী ডাকছে না, দেশের ফুল ফুটছে না—সে লেখা যতই ভাল

হোক, সেটা আমার লেখা কি ক'রে হয়? পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে সে দেশের আপন গন্ধ লেগে থাকে, কেবল বাংলাদেশেই আজ তা থাকবেনা? জন্মাবধি যা দেখে আসছি লেখবার বেলা তা যদি না লিখি তবে সে লেখা তো হবে মিথ্যা! সত্য কেবল মাত্র তাই যা আমি চোখে দেখেছি, নিজের মনে অনুভব করেছি। কিন্তু তবু এই সত্যকে ব্যক্ত করা সহজ কাজ নয়। সে সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে নাড়ীতে টান লাগবে, যে তা' পড়বে তারও ছত্রিশ নাড়ী চঞ্চল হবে। সেই লেখাই সত্য লেখা যাতে সকলের সঙ্গে যোগ থাকবে। এই সত্য-অভিব্যক্তির চেষ্টাকে ইংরাজীতে বলে সিনসিয়ারিটি। যে বাংলা লিখতে চায় এই সিনসিয়ারিটি হোক তার সাধনা।

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজনহীন পরমাদ
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ আলোকে এস ধীরে ধীরে
এই বেতসের বাঁশীতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ
ক্ষমা করো যত অপরাধ॥

—রবীন্দ্রনাথ